

টারজান এণ্ড হিজ্ সন

সব্যসাচী

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা -৯

সেপ্টেম্বর
১৯৬৫

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯



টারজান এণ্ড হিজ্‌ সন

এক

পুনর্মিলন

সুখ-দুঃখ মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী—চাকার মতো সুখ এক সময় উপরে উঠে আসে, আবার কখন আসে দুঃখ। সুখেরও এক সময় অবসান ঘটে, অবসান ঘটে দুঃখেরও।

টারজানকে ফিরে পাবার চেষ্টায় সুদূর ইংলণ্ড থেকে এসেছিলেন তার পিতা আর মাতা—ডাঃ উইলসন এবং তাঁর পত্নী। নোরাকে ফিরে পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলেন তার বাবা মিঃ রিচার্ড। নোরা আর টারজান—একজন আর একজনকে চিরকালের মতো আপনার ক'রে পাবার জন্যে করেছিলো মরণপণ।

তারপর একদিন সকলের মুখে ফুটে উঠেছিলো হাসি—দৈবক্রমেই একদিন দেখা হয়ে গেলো সকলের। তারপর যখন এক আনন্দমুখর প্রভাতে সকলেই স্বদেশে ফিরে যাবার জন্যে দিন গুনছে—সেই মুহূর্তে বিধাতার অভিশাপের মতো নেমে এলো এক ভীষণ দুর্দৈব।

ভূমিকম্প আর তার সঙ্গে প্রবল এক বন্যা এসে সবাইকে করে দিলো বিচ্ছিন্ন। কে যে বেঁচে আছে, আর কে যে নেই—কেউ আর সে খবর পেলো না। যারা বেঁচে রইলো—তারা বেঁচে রইলো মরার মতো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

সেদিনের পর অনেক দিন কেটে গেছে।

*   *   *   *

একটি একটি করে চারটি দেশী নৌকা চলেছে সারি সারি—প্রত্যেক নৌকায় চারজন ক'রে লোক দাঁড় টানছে। হু হু ক'রে জল কেটে এগিয়ে চলছে নৌকাগুলো। আর নৌকার আরোহীরা মনের আনন্দে তাদের স্বদেশীয় ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে গাইছে গান। সবার মুখেই হাসি—শুধু একজনের মুখেই হাসি নেই। চোখে তার যেন আগুন জ্বলছে!

বন্দিনী এক শ্বেতাঙ্গিনী রুদ্ধ আক্রোশে গজরাচ্ছে—কিন্তু কিছুই করবার নেই তার। হাত তার বুনো লতা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

বন্দিনী ভাবছে—এত বিশ্বাসঘাতক এই বুনোগুলো? সেবা ক'রে, শুশ্রূষা ক'রে সে তাদের সর্দারকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলো—আর তার এই প্রতিদান।

নাইরোবি শহরে তাকে শ্বেতাঙ্গদের হাতে পৌঁছে দেবে বলে এখন নিয়ে যাচ্ছে বুনোদের হাটে বিক্রি করে দেবার জন্যে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে সেই বন্দিনী আর ভাবছে।

এমন সময় এদের সর্দার এক হাঁক দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিলো বড় পিপুল গাছটি—ওর তলাতেই নৌকা বাঁধতে হবে।

তারপর সবাই নামলো ডাঙ্গায়। বন থেকে তারা শূকর শিকার ক'রে নেবে সঙ্গে—কাজেই মেয়েটাকে সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই।

কিন্তু কি করা যাবে তাকে নিয়ে? কিছুই করবার দরকার নেই—সে একলাই এখানে থাকবে। হাত তার বাঁধা—আর তাছাড়া এ অরণ্যে একলা বেরুবার সাহসই বা পাবে কোথায়?

কিন্তু যদি কোন নেকড়ে তাকে দেখতে পায়—...

তাহ'লে আর কি হবে? এটুকু ঝুঁকি তাদের নিতেই হবে!—

সর্দার সঙ্গীদের নিয়ে বল্লমহাতে বেরিয়ে গেলো অরণ্যের দিকে। সেই বন্দিনীকে রেখে গেলো তার ভাগ্যের উপর।

বন্দিনী ইংরেজ-দুহিতা। এতদিন যে নিজের মানসম্মান বাঁচিয়ে বুনোদের মাঝখানে কাটিয়েছে, গায়ের জোরও যে তার নেহাত কম নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো তখ্নি।

বুনোগুলো চোখের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই শ্বেতাঙ্গিনী তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দুই হাতে দিলো চাপ। সঙ্গে সঙ্গেই লতার বাঁধন গেলো ছিঁড়ে।

এইবার বন্দিনী মুক্ত হ'লো। সে আর এখানে থাকবে না—এক মুহূর্তের জন্যেও নয়। বরং এই গভীর অরণ্যে বাঘ, সিংহ বা যে কোন হিংস্র জানোয়ারের হাতে তার মৃত্যু হোক, তাও ভালো। কিন্তু তবু তাকে হাটের মাঝে কেউ বিক্রি করবে—এ অপমান সে সইতে পারবে না।

বেরিয়ে পড়লো মেয়েটি। তারপর সে চলতে লাগলো উলটো দিকে—যেদিকে বুনোগুলো গেছে, তারই উলটো দিকে। সে চললো—ছুটে চললো সে ঊর্ধ্বশ্বাসে। এইভাবে এক ঘণ্টা চলবার পর সে হাঁপিয়ে পড়লো। এইবার সে চললো ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্য দিয়েই অতি সন্তর্পণে।

হঠাৎ সেই শ্বেতাঙ্গিনী শুনতে পেলো বাঁশির মত একটা শব্দ—অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। চমকে উঠে সে ঐ দিকেই এগুতে লাগলো।

.. ।।—ঐ দিকে হয়তো কোন বুনোদের গ্রাম আছে, ~খানেই আশ্রয় পাওয়া যায়।

অনেকদিন বুনোদের কথা শিখে নিয়েছে, তাই হয়তো তাদের সঙ্গে ভাবও করে নিতে পারে সে। এই ভরসায়ই সে এগুতে লাগলো।

অনেকটা চলে এলো শ্বেতাঙ্গিনী—কিন্তু কোথায় সেই শব্দ! এতক্ষণে থেমে গেছে। কিন্তু, মনে হলো তার—এখান থেকেই যেন শব্দটির সৃষ্টি হয়েছিলো।

এক পা দুই পা ক'রে জঙ্গলের মধ্য দিয়েই সে এগুতে লাগলো।

কানে এল তার ডালপালা ভাঙ্গার শব্দ—চমকে উঠলো সে। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলো—এবার কিন্তু তার অবাক্ হবার পালা।

ছোট একটা ছেলে—পিঠে তার তীর, হাতে ধনু। ছেলেটি ধনুতে তীর জুড়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে।

এমন সময় মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ঐ ছেলেটিও বিস্মিত হয়ে চিৎকার ক'রে বলে উঠলো:

'তুমি কে? আমি ভাবলাম, বুঝি বুনো মোষ এগিয়ে আসছে!'

একে তো এই গভীর অরণ্য—তার মধ্যে আবার একলা একটা বাচ্চা ছেলেকে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে শুনে, সেই মেয়েটি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলো।

সে এগিয়ে এসে বড়োবড়ো চোখে তাকিয়ে রইলো ছেলেটির দিকে।

ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করলো: 'কে তুমি? কাকে চাও?'

হতাশ-ভরা কণ্ঠে জানালো সেই শ্বেতাঙ্গিনী :

'কি হবে তোমাকে সে কথা বলে! তুমি তো একেবারে বাচ্চা !'

হাতের ধনুকটা বাগিয়ে ধরে ছেলেটি বীরের মতো ভঙ্গী করে বললো :

'বলই না তুমি—কী হয়েছে তোমার !'

এবার সেই মেয়েটি সংক্ষেপে জানালো তার নৌকাযাত্রার কাহিনী। তারপর বললো :

'যদি একজন বন্দুকধারী জোয়ান মরদ লোক পাওয়া যেতো, তবে ঐ বদমাইশ বুনোগুলোকে উচিত মতো শিক্ষা দেওয়া যেতো।'

ছেলেটি তার কথা শুনেই দু'টো হাত মুখের কাছে এনে অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে এক চিৎকার করে উঠলো।

চমকে উঠলো মেয়েটি। জিজ্ঞাসা করলো সে :

'তুমি এমন করছো কেন ?'

ছেলেটি বললো :

'রাজাকে ডাকছি।'

রাজার কথা শুনে মেয়েটির মন আনন্দে নেচে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলো সে :

'তোমাদের রাজার বন্দুক আছে ক'টি !'

এবার অবাক হয়ে বললো ছেলেটি : 'বন্দুক ? বন্দুক দিয়ে কি হবে ? আমাদের রাজা শুধু হাতে সিংহ মারতে পারে! এই তো দেখবে'খন—এক্ষুণি এসে পড়বে।'

ছেলেটির কথা শেষ হতে না হতেই দূরে ডালাপালা ভাঙ্গার শব্দ

শোনা যেতে লাগলো। তারপরই সামনে এসে দাঁড়ালো বিরাটদেহ এক পুরুষ!

একটি মুহূর্ত মাত্র—তারপরই একসঙ্গে দু'জনে চিৎকার করে উঠলো।

'টারজান? নোরা?'

* * * *

টারজান আর নোরা—আবার তাদের দেখা হলো নেহাত দৈবক্রমেই।

অকস্মাৎ সম্বিত ফিরে এলো টারজানের। সে জিজ্ঞেস করলো—নোরা কীভাবে এলো এখানে?

নোরা সংক্ষেপে জানালো তার কাহিনী। বুনো মাঝীদের কথা শুনেই টারজানের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেলো।

সে একহাতে নোরাকে টেনে কাঁধে তুলে নিলো, আর একহাতে ধরলো গাছ থেকে ঝুলে-পড়া একটা লতা। তারপর ছেলেটাকে ডেকে বললো ঃ

'এসো আমাদের সঙ্গে।'

এই বলে একহাতেই টারজান এক লতা থেকে আর এক লতা ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো। ছেলেটাও অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে টারজানের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। এইভাবে তারা এক ঘণ্টার পথ পনেরো মিনিটে পার হয়ে এলো।

একটা মরা কুমির পড়ে ছিলো নদীর ধারে। টারজান এখানেই কাঁধ থেকে নামালো নোরাকে।



সামনে এসে দাঁড়ালো বিরাটদেহ এক পুরুষ ! [পৃষ্ঠা—১০

তারপর ছেলেটিকে বললো : 'একটু আগেই কুমিরটাকে মেরে রেখে গেছি। এর খানিকটা মাংস কেটে নাও। কাজে লাগবে।'

এই বলেই টারজান একটা গাছের লতা ধরে ঝুলে পড়লো। তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে টারজান অদৃশ্য হয়ে গেলো।

খানিকটা যাবার পর টারজান দেখতে পেলো—একটা গাছের নীচে সারি সারি চারখানা নৌকা দাঁড়িয়ে আছে—লোকজন নেই। খানিক অপেক্ষা করলো টারজান। তারপর যখন দূর থেকে মানুষের সাড়া পেলো, তখন চট্ ক'রে একটা নৌকায় উঠে পড়লো সে। তারপর নৌকা দিলো চালিয়ে।

এদিকে সেই বুনোগুলো ফিরে এসে দেখতে পেলো—একটা লোক একটা নৌকা নিয়ে পালাচ্ছে, আর মেমসাহেবটিও নেই।

হাঁকডাক ক'রে তারা তিনখানি নৌকা নিয়েই টারজানের পিছু পিছু ছুটলো। টারজান তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

নোরা এতক্ষণে টারজানের সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে টমের সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে নিয়েছিলো। তারা যখন কুমিরের দেহ থেকে বেশ খানিকটা মাংস কেটে বার করে নিয়েছে, ততক্ষণে টারজানও নৌকা নিয়ে চলে এসেছে।

চিৎকার করে বলে উঠলো টারজান :

'শীগ্‌গির তোমরা ঐ মাংসটা নিয়ে নৌকায় উঠে এসো। বুনোগুলো এসে পড়লো বলে।'

ঝটপট তারা উঠে এলো নৌকায়। বুনোদের নৌকাগুলো ততক্ষণে আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তাদের এক একটা নৌকায় পাঁচটা করে দাঁড় পড়ছে।

টারজান আর টম দু'জনেই দাঁড় বাইতে লাগলো—নোরা বসে আছে মাঝখানে। খানিকটা এগোবার পর টারজান নোরাকে বললো ঃ

'নৌকার ভিতর একটা দড়ি আছে। দড়িটা দিয়ে কুমিরের মাংসটা বেঁধে ওটা ঝুলিয়ে দাও নৌকার পিছনে।'

নোরা তাই করলো। বুনোদের নৌকাগুলো আরও খানিকটা এগিয়ে এলো।

আর একটা বাঁক পার হতেই সামনে দেখা গেলো বিকট আকার কতগুলো জন্তু। টম চিৎকার করে উঠলো ঃ 'ঐ দেখ সামনে জলহাতি কতগুলো।'

নির্ভীক কণ্ঠে বললো টারজান ঃ 'ঘাবড়ানোর কারণ নেই—এগিয়ে চলো এদের মধ্য দিয়েই।'

নোরা কিন্তু ভয়ে আঁতকে উঠলো। টারজান হেসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো ঃ 'ভয় নেই! এরাই আমাদের রক্ষা করবে।'

এই বলে বিরাট সেই জলহাতিগুলোর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চললো টারজানের নৌকা।

তাদের পিছনে পিছনেই ছুটে এলো বুনোদের নৌকাগুলো। জলহাতিগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত নির্বিবাদে খেলা করছিলো। টারজানের নৌকাটা ওরা গ্রাহ্যই করলো না। কিন্তু তাদের নৌকা পার হয়ে যাবার পরই জলহাতিদের নাকে ঢুকলো কুমিরের মাংসের গন্ধ।

জলহাতিগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো—তারা জল থেকে মাথা উঁচু করে ধরলো। এমন সময় তাদের মাঝখানে এসে পড়লো বুনোদের



জলহাতিগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো [পৃষ্ঠা—১৩

নৌকাগুলো—আর যায় কোথায়।

তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো জলের মধ্যে। জলহাতিগুলো কুমিরের মাংসের গন্ধ পেয়েই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। এখন নৌকা-গুলোকে দেখতে পেয়ে ভাবলো—এগুলোই বুঝি তাদের চিরশত্রু কুমির।

কুমিরের সঙ্গে জলহাতিদের চিরকালের আড়ি। কারণ কুমির জলহাতির বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে।

এইবার শত্রুদের বাগে পেয়ে জলহাতিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো নৌকাগুলোর উপর। চোখের পলকে তিনখানা নৌকা অথৈ জলে তলিয়ে গেল।

দূর থেকে টারজান, নোরা আর টম শুনতে পেলো আর্তকণ্ঠের চিৎকার। ততক্ষণ তারা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে—আর নোরা শুধু ভাবছে, কী ক'রে সেই অঘটন ঘটলো।

দুই

কুমির শিকারী

নোরা এলো টারজানের ঘরে। টমি যা বলেছিলো—নোরা দেখলো, সত্যি তাই। টারজান এখানে রাজা হয়েই বসেছে।

গ্রামের নাম মংবুডি—আর এ গাঁয়ের রাজাই হলো টারজান। বুনো অসভ্যদের গ্রাম—গ্রামবাসীরাই টারজানকে তাদের রাজা বলে মেনে নিয়েছে—মেনে নিয়েছে আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরাও।

টারজানের সঙ্গে নোরাকে দেখে গ্রামবাসীরা অবাক হয়েছিলো। বুদ্ধিমান যারা, তারা বুঝেছিলো—এই হবে তাদের রানী। টারজানের পাশে একেই মানাবে ভালো।

লাফিয়ে ছুটে এলো একটা ছেলে—বুনোদেরই ছেলে—নাম ইংলু। টমির বয়সী ইংলু, টমিরই বন্ধু। অনেকক্ষণ পরে টমিকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছে—আর টমির কানে কানে জানিয়েছে কি একটা খবর।

খানিক পরেই টমি আর ইংলু দু'জনেই উধাও।

ওদিকে নোরাকে নিয়ে একদল জটলা পাকাচ্ছে, আর বুড়োরা টারজানকে ডেকে নিয়ে গেছে একদিকে।

* * * *

ইংলু আর টমি চলেছে সতর্কভাবে। দু'জনের হাতেই তীর-ধনু। অনেকখানি চলবার পর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা পথের চিহ্ন দেখেই ইংলু বললো :



একটা কুমির গরিলা'র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর রবিন রয়ও গিয়ে
পড়লো তাদেরই কাছে।

'খুব সম্ভব এই পথটাই গেছে ও গাঁয়ের দিকে।'

টমিও ভাবলো—ও-গাঁয়ের লোকেরা টারজানকে যখন এত জরুরী তলব জানিয়েছে তখন নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে। আর তা' তাকে জানতেই হবে।

কিন্তু যদি টারজান তাদের দেখতে পেয়ে বকুনি দেয়! বললেই হবে যে তারা বনের মধ্যে শিকার করতে করতে পথ ভুলে এদিকে চলে এসেছে।

এগিয়ে যেতে লাগলো তারা। হঠাৎ সামনে পড়লো একটা গুহা। মনে হলো বুনো শুয়োরের ডেরা। কিন্তু তারা ভালো করে তাকিয়ে দেখলো যে এর ভেতর অনেককাল কোন শুয়োর ঢোকেনি। কারণ, গুহাটার মুখে রয়েছে মস্ত বড় একটা মাকড়সার জাল।

টমির কিন্তু মনে হলো—কাছেই যখন জলা জায়গা রয়েছে, তখন এর ভেতর কুমিরের বাসাও হতে পারে।

কিন্তু বেশি ভাববারও আর সময় রইলো না—দূরে তারা দেখতে পেলো একজোড়া পাখি। ভারী সুন্দর দেখতে আর অতি সুস্বাদু তার মাংস। ওই ঘুঘু দুটোকে শিকার ক'রে ঘরে নেবার জন্যেই তারা ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

দু'জনেই ছুড়লো তীর—একটা ঘুঘু পড়ে গেলো। দু'জনেই দৌড়ে গেলো ডোবার দিকে—তারপর সেখান থেকে পাখিটা হাতে তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে মনের আনন্দে ফিরে আসছে।

হঠাৎ পিছনে শোনা গেলো কিসের শব্দ। তাকিয়েই তাদের আক্কেল গুড়ুম! এক সঙ্গে কয়েকটা কুমির তেড়ে আসছে তাদের দিকে। তাদের জিবগুলো লকলক করছে।



তাকিয়েই তাদের আক্কেল গুড়ুম! [পৃষ্ঠা—১৭

পড়ে রইলো পাখি--পড়ে রইলো হাতের ধনু। পড়ি তো মরি ক'রে দু'জনে ছুটতে লাগলো তীরের দিকে।

ডোবা থেকে পাড়টা অনেকটা উঁচু আর খাড়া। নামবার সময় তারা লাফিয়ে নেমেছিল—কিন্তু উঠবার সময় সে সুযোগ পাওয়া গেলো না।

ওরাও ছুটছে—কুমিরগুলোও তেড়ে আসছে। এক্ষুণি কোন উপায়ে উপরে উঠতে না পারলে নির্ঘাত যেতে হবে কুমিরের পেটে।

আর চিন্তা করবারও সময় নেই। সামনেই যে লতা ছিলো, টমি চট্‌ করে তারই একটা ধরে তরতর ক'রে বেয়ে উপরে উঠে গেলো।

ইংলু কিন্তু যেই লতাটা ধরে উঠতে চাইলো, অমনি লতাটা গেলো ছিঁড়ে। উপরে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলো টমি,—তারপর ইংলুকে টেনে তুলতে লাগলো।

একটা কুমির কিন্তু ইংলুর পিঠে লাগালো কামড়। ভাগ্যিস তার পিঠে তখনও ঝুলছিলো তীরের থলিটা—কুমিরের কামড়টা গেলো তারই উপর দিয়ে।

ইংলুও উপরে উঠে এলো—কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই—যদি কুমিরগুলো বেয়ে উঠে!

আর সত্যি সত্যি কুমিরগুলোও যেন বেয়ে বেয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করতে লাগলো। টমি আর ইংলু আবার দৌড়তে আরম্ভ করলো।

খানিক এগুনোর পর সামনে আবার একটা পথের রেখা ভেসে উঠলো।

তারা ভুলে গেলো তাদের বিপদের কথা। আবার তারা চললো ঐ পথ ধরে—তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ পথেই তারা ওদের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে।

এতক্ষণে তারা পিছন দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হলো—না, কুমিরগুলো আর তাড়া করছে না।

তারা দুপাশের ঝোপঝাপ দুহাতে ঠেলে সরিয়ে এগুতে লাগলো। সামনে পড়লো একমাথা-উঁচু ঘাসক্ষেত। বিরাট ঘাসের ক্ষেত—ঘুরে যেতে গেলে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। তার চেয়ে ওই ঘাসের মধ্য দিয়ে গেলেই পথ অনেকটা সহজ হয়।

অবশ্য ভয় তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্রও নেই। তাই ঘাসের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এতটা পথ যেতে তারা আর দু'বার ভাবলো না।

* * * *

ওদিকে টারজান দলবল সঙ্গে নিয়ে আগেই পৌঁছেছে ওদের গ্রামে। সেখানে বুনোদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করছে—কীভাবে খালের কুমিরদের তাড়ানো যায়!

হঠাৎ সামনের ঘাসের জঙ্গলটা নড়ে উঠলো। চিৎকার করে উঠলো বুনোরা—

'টারজান, দেখ—ঐ ঘাসের মধ্য দিয়ে বুঝি কোন জন্তু এগিয়ে আসছে!'

বুনোরা বল্লম বাগিয়ে ধরলে। হিংস্র জন্তুর অতর্কিত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই তারা প্রস্তুত হয়ে রইলো।

সামনের দিকের ঘাসগুলো দু'ফাঁক ক'রে বেরিয়ে এলো টমি আর ইংলু।

বুনোরা হাত থেকে বল্লম নামিয়ে রাখলো—অট্টহাসি হেসে উঠলো টারজান।

সস্নেহে একদিকে টমিকে আর এক দিকে ইংলুকে জড়িয়ে ধরে টারজান বললো :

'এক্ষুণি তো বল্লমের খোঁচা খেয়ে মরতে ! ওরা তো ভেবেছিলো ···বুঝি বা কোন সিংহই এগিয়ে আসছে।'

টারজানের কথা শুনে বুনোরা কাঁচুমাচু করতে লাগলো।

টারজানের আদরে টমির ভয় দূর হয়ে গেলো। তারা যে পালিয়ে এসেছে এখানে, তারজন্যে টারজান তো কিছুই বললো না।

তাই সাহসে ভর করে সে টারজানের কাছে আস্তে আস্তে জানতে চাইলো :

'ওরা সব বল্লম নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ? আর তুমিই বা এখানে এসেছো কেন ?'

জন্ম থেকে টারজান অরণ্যে পালিত : হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গেই তার বাস। তাদের সঙ্গে থাকা বা যে কোন মুহূর্তে বিপদের মুখে পড়াটাকে সে অস্বাভাবিক বলে মনে করে না। তাই সে টমি বা ইংলুকে এখানে দেখে মোটেই বিস্মিত হলো না, কিংবা অসন্তুষ্ট হলো না। বরং বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের সাহস বাড়ুক তাই তার ইচ্ছা।

তাই টারজান টমির এই আগ্রহ দেখে তাকে ধমকে না দিয়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে বললো সব।—

কুমিরের উপদ্রবে গ্রামবাসীদের চলাচল কঠিন হ'য়ে পড়েছে। অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলতে গেলে প্রতিমুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা—তাই

জলপথ দিয়ে চলাচলই অনেকটা নিরাপদ। কিন্তু যে খালটা দিয়ে তারা নদীতে পড়বে সেই খালটায় সম্প্রতি কয়েকটা কুমির ভয়ানক উপদ্রব শুরু করেছে। ঐদিনই একটা নৌকো উলটে দিয়ে নৌকার সব ক'টা লোককে কুমিরগুলো সাবাড় করেছে—তাই তারা টারজানকে জরুরী খবর দিয়ে আনিয়েছে—টারজান যাবে কুমির-শিকারে।

টারজানের কথা শুনে টমি আর ইংলু—তু'জনেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তারাও বায়না ধরলো—টারজানের সঙ্গে তারাও যাবে কুমির-শিকারে।

টমি আর ইংলুর উৎসাহ দেখে টারজানও খুব খুশি। সে বললো :

'বেশ তো! এসো তোমরা আমার সঙ্গে।'

নানারকম লতা দিয়ে বুনোরা বিরাট এক জাল তৈরি করে-ছিলো। টারজান বুনোদের হুকুম দিলো সেই জালটা নিয়ে আসতে। দশজন জোয়ান মিলে জালটাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এলো ওখানে।

এবার এখান থেকে সবাই মিলে জালটা বয়ে নিয়ে চললো খালের ধারে। টমি আর ইংলু—তারাও তু'দিকে ঝুলে-পড়া জালটার তু'মাথা তুলে ধরলো।

ধীরপদে তারা গিয়ে পৌছালো খালের ধারে। টারজানের ইঙ্গিতে তারা জালটাকে নামালো সেখানে। এবার টারজান চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—কোথায় কোন্‌দিকে জালটাকে খাটালে তাদের সুবিধা হবে।

খানিক তাকিয়ে টারজান দেখলো—ওপারে একটা বেশ শক্ত গাছ আছে। মনে মনে বুদ্ধি স্থির করে নিয়ে টারজান দু'জন বুনোকে আদেশ দিলো:

'দড়ির একটা মাথা ওই গাছটার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে এসো।'

ওপারে তাকিয়েই ওদের আক্কেল-গুড়ুম। সর্বনাশ—সাঁতরে এই নদী পার হয়ে তবে ওপারে গাছের সঙ্গে দড়ি বাঁধতে হবে!

দড়ি আর বাঁধা হবে না—তার আগেই যে ওদের কুমিরের পেটে যেতে হবে। ওরা ভয়ে ভয়ে টারজানকে জানালো যে গাছের সঙ্গে দড়ি বাঁধতে ওদের কোন আপত্তি নেই—কিন্তু নদীটা পার হওয়াই যে মুশকিল!

ওদের ওই ভীরুতায় চটে গিয়ে টারজান নিজেই দড়ির বোঝা কাঁধে তুললো। দড়িটার একটা মাথা জালের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে—অন্য মাথাটা ওপারে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে।

টারজান জলে নামলো—টমি আর ইংলু বুনোদের সঙ্গে পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দড়ি ছেড়ে ছেড়ে টারজান সাঁতরে সাঁতরে এগুতে লাগলো। খানিক দূর যেতেই—তার পিছনে ভুস্ করে উঠলো।

তীর থেকে চিৎকার করে উঠলো টমি:

'কুমির! কুমির!'

চট্ করে টারজান পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নিলো। তারপর নির্বিকারভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

বুনোগুলো ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো। কুমির দু'টো একসঙ্গে একেবারে টারজানের কাছে এসে পড়লো। টারজান চট্ করে

একটা কুমিরের পিঠে ভর দিয়ে অন্যটাকে ডিঙ্গিয়ে একটু পিছনে পড়লো।

কুমির দু'টো আবার ঘুরতে গিয়ে অনেকটা পিছনে পড়ে গেলো —ইতোমধ্যে টারজান প্রায় ওপারে পৌঁছে গেলো। আর একবার কুমির দু'টোকে ধোঁকা দিয়েই ওদের পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে উঠলো ডাঙ্গায়।

কুমির দু'টো আবার তাড়া করে এলো—কিন্তু আর টারজানের নাগাল পেলো না। টারজান ততক্ষণে গাছের ডগায় উঠে গেছে। তারপর কুমির দু'টো নেমে যেতে টারজানও গাছ থেকে নেমে এলো।

টারজানকে সুস্থ দেখতে পেয়ে ওপার থেকে বুনোগুলো আনন্দে কোলাহল ক'রে উঠলো।

টারজান দড়িটাকে একপাক গাছের সঙ্গে জড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো ঃ

'তোমরা যে শূকরের মাংস সঙ্গে এনেছো, সেই মাংসের টুকরা-গুলো জালের মধ্যে পুরে দাও।—দিয়েছো?'

ওপার থেকে বুনোরা চিৎকার করে জানালো ঃ

'হ্যাঁ, দিয়েছি।'

টারজান ডেকে বললো ঃ

'এবার জালটাকে জলে নামিয়ে দিয়ে দড়ির ও-মাথাটা ধরে াখো।'

টারজানের নির্দেশমতোই তারা কাজ করে যেতে লাগলো। বার টারজান দড়িটা টেনে টেনে জালটাকে খালের মাঝখানে নিয়ে াসতে লাগলো।

এদিকে টমি আর ইংলু দেখলো ওরা কোন কাজই করতে পারছে না। তখন সাত তাড়াতাড়ি ক'রে চড়লো গিয়ে একটা গাছে। গাছের একটা ডাল একেবারে খালের অনেকটা ভিতর দিকে এগিয়ে গেছে। তারাও ডাল বেয়ে বেয়ে একেবারে সেইখানেই গিয়ে উপস্থিত।

তারা যেখানে গেলো, সেখান থেকে ছ'দিকেই খালের জল অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। টমি আর ইংলু ছ'জন ছ' দিকে তাকিয়ে রইলো।

যেদিক থেকেই কুমির আসবে, তারা অনেক দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে আগেভাগেই সবাইকে জানিয়ে দিতে পারবে।

খালের জলে শূকরের মাংস পড়েছে। শীগ্গিরই তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত জলে। দূরের কুমিররাও তার গন্ধ পেয়ে গেছে।

টমি দেখলো—অনেক দূরে ভুস্ ভুস্ ক'রে উঠলো জল। সে চিৎকার ক'রে বলে উঠলো :

'ঐ যে দেখা যায়। কুমির আসছে।'

ইংলু যেখানে বসেছিলো—সেখান থেকে কিছুই দেখা যায় না। কুমির দেখবার লোভে সেও এগিয়ে এলো টমির কাছে।

গাছের একেবারে মগডালে এসে পৌছুলো ছ'জন। ডাল আর সেই ভার সইতে পারলো না।

মটমট করে ডালটা ভেঙ্গে গেলো—আর সঙ্গে সঙ্গেই টমি আর ইংলু ছ'জনেই ঝপাং করে পড়লো জলে—একেবারে জালের কাছটিতেই।



দু'জনেই ঝপাং করে পড়লো জলে— [পৃষ্ঠা—২৫

চিৎকার করে উঠলো টমি আব ইংলু—পাড় থেকে চেঁচিয়ে উঠলো বুনোরা, ওপার থেকে সাড়া জানালো টারজান।

জলে পড়ে নাকানি চুবানি খাচ্ছে টমি আর ইংলু—তবু ভাগ্যিস্, সাঁতার জানে তারা, তাই জলে ডুবলো না।

কিন্তু কুমিরের দল এসে পড়লো বলে। দূর থেকে মাংসের গন্ধ পেয়েছে, আর কাছে এসে দেখতে পাচ্ছে টাটকা তাজা ছুটো মানুষের বাচ্চা। বুঝি কুমিরদের নোলায়ও জল এসে গেলো।

টারজান চেঁচিয়ে বললো ঃ

'শীগ্‌গির জালের ভিতর লাফিয়ে পড়, শীগ্‌গির। ঐ যে কুমির ধরলো বলে।'

টমির কান ছিল অত্যন্ত সজাগ। সে টারজানের চিৎকার শুনবার সঙ্গে সঙ্গে সেঁধিয়ে গেলো জালের মধ্যে আর সঙ্গে টেনে নিয়ে এলো ইংলুকেও।

টারজান চিৎকার করে উঠলো এপারের দিকে তাকিয়ে ঃ

'শীগ্‌গির জাল টেনে নাও! টানো, টানো।'

বলে নিজেও দড়িটা গাছ থেকে খুলে ঢিলে করে দিলো।

বুনোরা প্রাণপণ টানতে লাগলো জাল।

কুমিরগুলো জালের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগলো। একবারও জালের টান থামছে না বলে ওরাও শুধু মুখ হাঁ করেই রাখলো। মুখের এত কাছে ছুটো মানুষের বাচ্চাকে পেয়েও তারা মুখে পুরতে পারলো না।

এদিকে টারজানও অতি দ্রুতগতিতে এপারে এসে পৌঁচেছে।

যে কুমিরটা ছিল ওদের খুব কাছে, নিপুণ হাতে টারজান বর্শা ছুড়ে মারলো ওর দিকে—রক্তে খালের জল রাঙা হয়ে উঠলো।

তারপরই শেষ হেঁচকা টানে সবাই মিলে টমি আর ইংলু-সুদ্ধ জালটাকে তুলে আনলো ডাঙ্গায়।

এবারে টারজান তাদের তু'জনকে তু'হাতে ধরে চললো আস্তানার উদ্দেশ্যে। আর বলে গেলো ওদের—আগের মত করেই জাল টানাতে।

তু'টি জোয়ান মরদ বুনো এবার সাহস করে দড়ি কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লো খালের জলে।

তিন

নীল দস্যুদের কবলে

বেশ সুখেই তাদের দিন কাটছে। মংবুডি গ্রামে বুনোদের সঙ্গে বেশ মিলেমিশেই আছে টারজান, নোরা আর টমি। তাদের কারুর আর সঙ্গী-সাথীর বিশেষ অভাব নেই।

এ ছাড়াও আছে বিরাট অরণ্য। আজীবন অরণ্যে কাটিয়ে টারজান তার মায়া কাটাতে পারেনি—তাই সুযোগ পেলেই সে ছুটে যায় অরণ্যের কোলে। সেখানে আছে কত জীব-জন্তু—তাদের সঙ্গেও টারজানের বড় সদ্ভাব। তারাও সবাই টারজানকে তাদের একজন বলে গ্রহণ করে নিয়েছে।

আর টারজানও বুঝে নিয়েছে তাদের ভাষা—তাদের সঙ্গেই চলে তার অন্তরঙ্গ আলাপন। সবাই টারজানকে একান্ত আপনার জন বলেই মনে করে থাকে।

যে স্নেহের বশে হিংস্র জীব-জন্তুও যায় হিংসা ভুলে, সেই স্নেহ দিয়েই টারজান জয় করেছে ওদের হৃদয়—তাই বিপদে-আপদে বনের পশুই তার সহায় হয়ে দাঁড়ায়।

টারজান, নোরা আর টমি—বেরিয়েছে বন-বিহারে। বাহন তাদের দুটো উটপাখি! পোষমানা ঘোড়ার মতই উটপাখি দুটোও তাদের আদেশ মেনে চলে।

একটার পিঠে চড়েছে টারজান আর একটার পিঠে টমিকে সঙ্গে নিয়ে উঠেছে নোরা।

মাঝে মাঝেই তারা এ রকম বেড়াতে বেরোয়; কয়েকদিন হয়তো আর গ্রামেই ফেরে না—যেদিকে হু'চোখ যায়, সেদিকেই ঘুরে বেড়ায়।

খাবার-পরবার ভাবনা নেই—বনে কত রকম ফল-মূলের গাছ আছে। কাজেই অনায়াসে তাদের দিন কেটে যায়।

এবারও বেরিয়েছে তারা অনির্দেশ-যাত্রায়—কয়েকদিন বাইরে বাইরে ঘুরে তারপর ফিরে আসবে আবার গ্রামে। তাদের সঙ্গে সম্বল শুধু তীর আর ধনুক।

তিন দিন পথ চলবার পর এক সময় তারা এক ভীষণ বিপদের সামনে পড়লো। সকালের সূর্য মাথার উপর উঠে গেছে, অথচ পথে কোথাও এক ফোঁটা জলের সন্ধান পায়নি।

নোরা স্কুলে ভূগোল পড়েছে—সেই জ্ঞানের সাহায্যে সে স্পষ্টই বুঝতে পারলো যে, পথ চিনতে না পেরে তারা মরুভূমির কাছাকাছি কোথাও চলে এসেছে। কাজেই আর সামনের দিকে এগুনো নিরাপদ নয়—যত তারা এগুবে ততই তারা মরুভূমির কাছে গিয়ে পড়বে।

জল না পেয়ে টমি অস্থির হয়ে উঠেছে—অস্থির হয়ে উঠেছে নোরাও। কিন্তু কোথায় পাবে জল—কে তাদের জলের সন্ধান দেবে। সারাটা পথে কোন জনপ্রাণীর সাড়া পায়নি।

অকস্মাৎ বুঝি বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন। হঠাৎ সামনে দিয়ে ছুটে গেলো হুটো হরিণ।

তাদের চলার ভঙ্গী দেখেই টারজান তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো। হুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু একফালি পথ—সেই পথেই চলছে হরিণগুলো।

টারজান বুঝতে পারলো—ওরা চলেছে জলের সন্ধানে—নিশ্চয়ই ওদিকে কোথাও জল আছে।



হঠাৎ সামনে দিয়ে ছুটে গেলো ছুটো হরিণ। [পৃষ্ঠা—৩০

টারজানও উটপাখিকে চালালো হরিণদের পিছু পিছু—সঙ্গে চললো নোরা আর টমির উটপাখি।

টারজানের অনুমান সত্যি। খানিকটা এগুনোর পরই টমি চিৎকার ক'রে উঠলো ঃ

'ঐ যে দেখা যায় জল!' টমির তাড়ায় উটপাখি চললো আরো দ্রুতগতিতে। তার যেন আর দেরী সইছে না।

তারা এগিয়ে দেখলো—সুন্দর একটা পুকুরের মতো—পাহাড় থেকে ঝিরঝির করে ঝরনার ধারা বেয়ে পড়ছে ঐ পুকুরে।

পুকুরের চারদিক গাছ-গাছড়ায় ছেয়ে আছে—রোদ বিশেষ পড়তে পায় না বলেই বুঝি জল তার শুকোয় না।

টলটল করছে জল—কি পরিষ্কার! নীচের বালুকণাগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

জল খাবার কোন পাত্র নেই—আর তার প্রয়োজনই বা কিসের? উবু হয়ে জলে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়েই জল খেতে লাগলো টমি—উটপাখিগুলোও জলে তাদের ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো।

টারজান কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। সে সন্দিগ্ধ-ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগলো আর জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগলো।

তারপর খুব নীচু গলায় নোরা আর টমিকে জানালো যে, সে বেবুনের গন্ধ পাচ্ছে। হয়তো কাছে ধারেই কোথাও বেবুন রয়েছে। কিন্তু তারা যেন ভয় না পায়—ভয় পেলেই বেবুনরা তাদের আক্রমণ করবে।



নোরা পালাচ্ছে, আর অব্যর্থ সন্ধানী টারজান তার ধনুকে তীর জুড়ছে ।

একমাত্র মনের জোর আর সাহস ছাড়া ওদের হাত থেকে রক্ষার আর কোন পথ নেই।

টমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'কি ক'রে তুমি টের পেলে?'

টারজান বললো ঃ

'আমি প্রায় সারা জীবন তো ওদের সঙ্গেই কাটিয়েছি—তাই ওদের গন্ধেই আমি টের পাই। আমি ওদের ভাষা বুঝতে পারি, এমন কি, ওদের সঙ্গে কথাও বলতে পারি।'

টারজানের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো দুটো বেবুন—গায়ে তাদের অসুরের মতো শক্তি।

টারজান ইঙ্গিতে নোরা আর টমিকে বললো ঃ

'ভয় পেয়েছো যেন বুঝতে না পারে। তা' হ'লেই কিন্তু আক্রমণ করবে।'

বেবুন দুটোও ওদের দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সুযোগ বুঝে টারজানও কিচির মিচির ক'রে ওদের কি যেন বললো।

টারজানের কথা শুনে বেবুনদুটো অবাক্ হয়ে কি যেন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো।

তারপর টারজানের দিকে তাকিয়ে তারাও কিচির মিচির ক'রে কি বললো।

বেবুন আর টারজানের কথাবার্তাকে মানুষের ভাষায় দাঁড় করালে এই রকম হয়।

টারজান বললো ঃ

'ভাইরা ! তোমরা এত চটে আছো কেন ?'

বেবুনরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো ।

একজন বললো ঃ

'উটের পিঠে চড়ে নীল পোশাক পরে যারা এসেছিলো এটি কিন্তু তাদের মতো নীল পোশাক-পরা নয় ।'

আর একটি বললো ঃ

'এর গায়ের গন্ধও তো ওদের মতো নয় ।'

তখন দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করলো যে, টারজানের কাছে ওদের অসুবিধের কথা খুলে বলবে ।

বেবুন বললো ঃ

'গতকাল কয়টা মানুষ এসেছিলো, তাদের হাতে ছিল লাঠি—লাঠি থেকে আগুন বেরোয় আর তাতে বাজ আছে। তারা আমাদের কজনকে মেরে ফেলেছে, আর একজনের অবস্থা এমন যে যন্ত্রণায় সে এখনও চিৎকার করছে ।'

টারজান জিজ্ঞেস করলো ঃ

'কোথায় সে ?'

একটা বেবুন জানালো ঃ

'ঐ যে দূরে পাহাড়টা দেখা যায়, সেই পাহাড়ের গুহায় রয়েছে ।'

টারজান বললো ঃ

'আমি কিন্তু তার যন্ত্রণা সব এক্ষুণি দূর করে দিতে পারি ।'

টারজানের কথা শুনে বেবুনরা মহা খুশী। তারা তক্ষুণি টারজানকে আমন্ত্রণ জানালো তাদের গুহায় যাবার জন্যে। টারজানও রাজী ।

টারজান তখন নোরা আর টমিকে সাবধান করে বলে দিয়ে গেলো :

'উটপাখিগুলো রইলো এখানে, আর তোমরাও সাবধানে থেকো। আমি বেবুনটাকে দেখে আসি আর ওদের আস্তানাটারও সন্ধান নিয়ে আসি।'

টমি খুব বাহাদুরি ক'রে বললো :

'ঠিক আছে, তুমি যাও। আমিই তো আছি এখানে। উটপাখি-গুলোকে আমিই তদারক করছি।'

বেবুনদুটো পথ দেখিয়ে যেতে লাগলো—টারজান চললো তাদের পেছন পেছন।

আঁকা-বাঁকা পথ—মানুষের তৈরি-করা পথ তো নয়—কাজেই টারজানকে পথ তৈরি করেই যেতে হলো। কখনো মাটির ওপর দিয়ে, কখনো গাছের ওপর দিয়ে আর কখনও-বা গাছের লতা ধরে ঝুলে ঝুলে বেবুনদের সঙ্গে এগুতে লাগলো।

পাহাড়টা ঘুরে তারা খুঁজে পেলো বেবুনদের আস্তানা। আস্তানার মুখেই টারজান দেখতে পেলো ক'টা বেবুনকে—মরে পড়ে আছে।

তারপর ওরা তাকে নিয়ে গেলো গুহার মধ্যে। টারজান ঢুকেই দেখলো—শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে একটা বেবুন! বন্দুকের গুলিতে তার দেহে ঘা হ'য়ে গেছে—তারই যন্ত্রণা।

যন্ত্রণায় কাতর বেবুনটা অকস্মাৎ টারজানকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলো। টারজানই তখন ওদের ভাষায় কথা বলে বুঝালো যে, সে শত্রু নয়—বন্ধু।

মানুষের মুখে ওদের ভাষা শুনে সেও সান্ত্বনা পেলো। তখন টারজান আরও এগিয়ে গিয়ে তার ঘা-টা ভালো ক'রে দেখলো।

তারপর তার সঙ্গী বেবুনছুটোকে বললো—মুখে করে জল এনে ঘায়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে ঘা-টা ধুয়ে দিতে।

এতে যন্ত্রণার উপশম হবে কিনা সে-সন্দেহ মনে জাগলেও বেবুনরা টারজানের আদেশ পালন করতে লাগলো।

টারজান তখন তাদের বললো ঃ

'তোমরা একটু অপেক্ষা করো—আমি এক্ষুণি ঘুরে আসছি।'

এই বলে টারজান ছুটে বেরিয়ে গেলো। তারপর এখানে সেখানে ঘুরে খুঁজতে লাগলো কতকগুলি লতাপাতা।

বন্য জন্তুদের কোন ডাক্তার-বদ্যি নেই—অথচ তারাও রোগে পড়ে, অসুখে ভোগে। আবার নিজেরাই তার চিকিৎসাও করে।

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদবশেই বুঝি ওরাও কতকগুলি গাছ-পালা খুঁজে বার করেছিল। টারজান ওদের সঙ্গেই চিরকাল কাটিয়ে এসেছে—তাই কোন্ রোগে কোন্ গাছগাছড়া ব্যবহার করতে হয়, তা ওর ভালো করেই জানা ছিল।

সেই গাছই খুঁজে বেড়াচ্ছে টারজান, যার পাতা রগড়ে ঘায়ে দিলে যন্ত্রণা তক্ষুণি কমে যাবে, আর ক্ষতও ক্রমে শুকিয়ে যাবে।

অনেক খুঁজে পেতে টারজান কয়েক রকম গাছের শিকড়, বাকল আর পাতা নিয়ে এসে ঢুকলো বেবুনদের গুহায়।

এদিকে তখন ঘা ধোয়ানো হয়ে গেছে। টারজান দু'ভাগে ঐ পাতালতাগুলোকে রাখলো। এক ভাগ থেঁতলে তার রস ফোঁটা ফোঁটা করে ঘায়ের ওপর দিতে লাগলো।

আহত বেবুনটার ঘায়ে ঐ রস পড়তেই সে যেন চিড়বিড় করে উঠলো। টারজানের ইঙ্গিতে আর দুটো বেবুন তার হাত-পা চেপে ধরে রাখলো। তখন টারজান সবটা রস ঢেলে দিয়ে তার উপর ঐ থেঁতলানো পাতা চেপে দিলো।

তারপর লম্বা লম্বা দুটো গাছের পাতা এনে তা' দিয়ে ঘা-টাকে সুন্দর ক'রে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো টারজান।

অন্য ভাগের পাতাগুলি দিলো বেবুনটাকে চিবিয়ে খেতে। খাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেবুনটা ঘুমিয়ে পড়লো। তার কখন ঘুম ভাঙ্গবে—তারি জন্যে টারজান অপেক্ষা করবে। তাই এই সময়টা টারজান অন্য বেবুনদুটোর সঙ্গে খাতির জমাতে লাগলো।

টারজান চলে যাবার পর নোরা একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করতে লাগলো। আর টমি তীর-ধনুক হাতে নিয়ে নানা জায়গায় লক্ষ্যভেদ করতে লাগলো। কখনও দৌড়ে গিয়ে তীর কুড়িয়ে আনে, কখনও বা উড়ন্ত পাখি লক্ষ্য ক'রে তীর ছোঁড়ে, আর কখনও বা তীর দিয়ে গাছ থেকে ফল পাড়তে চেষ্টা করে।

উটপাখি দুটো চরে বেড়াতে লাগলো। বেড়াতে বেড়াতে তারা বেশ খানিকটা দূরে চলে গেলো।

অকস্মাৎ টমির চিৎকারে নোরার তন্দ্রা ভেঙে গেলো। টমি বলছে ঃ

'দেখো দেখো—কী অদ্ভুত মানুষ !'

নোরা তাকিয়ে দেখলো—দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে ক'জন লোক—তাদের বাহন উট ; তাদের সারা দেহ আর মাথা নীল কাপড়ে ঢাকা।

নোরা ভয় পেয়ে গেলো। এই নির্জন অরণ্যে এতগুলো বন্দুকধারী লোক দেখে ভাবলো—এদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভালো নয়। সে টমিকে ডেকে কাছে নিয়ে এসে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলো।

এদিকে নীল পোশাক-পরা লোকগুলো জলাশয়ের কাছে এসে উট থেকে নেমে আঁজলা ভরে জল খেলো। উটগুলোও প্রাণ ভরে জল খেতে লাগলো।

জল খেয়েই লোকগুলো চারদিকে কি যেন খুঁজতে লাগলো। খানিক পরে তারা বললো :

'কি অদ্ভুত! বেবুন ক'টাকে এখানে মেরে রেখে গেলুম—কোথায় গেলো সেগুলো!'

একজন বললো :

'ওই দেখো—ঝোপের আড়ালে বোধ হয় ওরা নড়াচড়া করছে।'

তিনজন এগিয়ে গেলো ঝোপের দিকে। সেখানে নোরা আর টমিকে দেখেই তারা অবাক্।

কী অদ্ভুত ব্যাপার! বেবুনগুলোই কি মানুষ হয়ে গেলো নাকি? এই নির্জন অরণ্যে এই মেমসাহেব আর বাচ্চা সাহেবটাই বা কোথেকে এলো!

কিন্তু নষ্ট করবার মত সময় তাদের নেই। এই নীল দস্যুগুলি লুটতরাজ করে যা পায়, তাই বিক্রি করে।

সওদা হিসাবে এরাও মন্দ হবে না। মেমসাহেব আর বাচ্চা সাহেবটাকে বাজারে বিক্রি করলে বেশ চড়া দামে বিক্রি হবে।

এই ভেবে নীল দস্যুগুলি ওদের দিকে এগিয়ে গেলো।

টমি বুঝেছিলো—ওরা যেই হোক, তাদের বন্ধু নয়। তাই সে তার ধনুকে তীর জুড়তে গেলো। নোরা তখন তার হাত চেপে ধরলো।

নোরা ওদের পিঠে বন্দুক দেখে বুঝেছে—ওই তীর ছুড়ে কিছুই লাভ হবে না। ওরা বন্দুকের গুলিতে দু'জনকেই সাবাড় ক'রে দেবে।

টমিকে একহাতে ধরে নোরা প্রাণভয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো। দস্যুরা দৌড়ে হয়তো ওদের ধরতে পারবে না—এই ভেবে তিনজনই চট্ করে উটের পিঠে চড়ে ওদের ধাওয়া করতে লাগলো।

নোরা আর টমি দৌড়ে বেশিদূর যেতে পারলো না—দস্যুরা শীগ্গিরই তাদের ধরে ফেললো। তারপর ওদের দুজনকে জোর করে উটের উপর চড়িয়ে জোরকদমে উট চালিয়ে দিলো।

নোরা এবং টমি একসঙ্গে চিৎকার করে টারজানকে ডাকতে লাগলো। তাদের সেই চিৎকার হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগলো।

চার

দস্যুদের হাত থেকে

বেশ কিছুক্ষণ পরে বেবুনটার ঘুম ভাঙলো আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেছে। হাত পা চেপে ধরে জোর ক'রে তার গায়ে ওষুধ ঢেলে দিয়েছিলো বলে সে টারজানের উপর যেমন চটেছিলো, এখন ভালো হয়ে তেমনি খুশী হলো। নিজের ভাষায় সে টারজানকে বুঝি ধন্যবাদও জানালো।

টারজানের এখানকার কাজ শেষ হলো—এবার সে ফিরে যাবে সেই ছোট্ট সরোবরটির ধারে, যেখানে নোরা আর টমিকে রেখে এসেছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যেই বুঝি কয়েকটা বেবুনও চললো টারজা-নের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে টারজান ফিরে এলো সেই জায়গাটিতে—যেখানে ছিল নোরা আর টমি।

কিন্তু—কী আশ্চর্য। কোথায় নোরা, আর কোথায়ই বা টমি! আরও আশ্চর্য—উটপাখি দু'টোও তো রয়েছে ওখানে—ওই যে কিছু দূরেই চরে বেড়াচ্ছে।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে টারজান তাকালো চারদিকে। জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগলো—একটা কি যেন অপরিচিত গন্ধও সে অনুভব করতে পারছে।

হঠাৎ তার চোখ পড়লো মাটির দিকেই। কয়েকটা পায়ের ছাপ—উটের পায়ের ছাপ। বেবুনগুলো তখনই কিচির মিচির ক'রে

টারজানকে বুঝলো যে সেই কালচামড়া লোকগুলোর গন্ধ পেয়েছে।

রাগে টারজানের নাক ফুলে উঠলো। তার নোরা আর টমিকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবে দস্যুরা—এত দুঃসাহস!

টারজানের সংকেত শুনে ছুটে এলো উটপাখি দুটো। টারজান চট্ ক'রে চড়ে বসলো একটার পিঠে—তার পরই তাকে ইশারা করলো জোর কদমে ছুটে চলতে।

প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে ছুটে চললো উটপাখি—একটা টারজানকে পিঠে নিয়ে ছুটছে—আর একটা অমনি ছুটছে তার সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গীটা আগে আগে ছুটে চলেছে। টারজান আরো জোরে ছুটে ওটাকে পেছনে ফেলে যেতে চেষ্টা করলো।

যেন বাজি ধরে চলছে দুটো উটপাখি—তাদের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগলো।

বুনো জন্তুরা প্রাণের ভয়ে দুরন্তবেগে ছুটে চলে—কিন্তু উটপাখি যখন দ্রুত ছুটতে থাকে তখন ঘোড়াও থাকে কত তফাতে পড়ে—উটের তো কথাই নেই।

উটের পিঠে চড়ে অনেকটা আরাম ক'রেই নীলদস্যুগুলো নোরা আর টমিকে নিয়ে পালাচ্ছিল। পিছন থেকে যে আবার কেউ উটপাখি নিয়ে তাদের তাড়া করতে পারে, সে কল্পনাও তারা করতে পারেনি।

টারজানের তাড়া খেয়ে উটপাখি চলছে ছুটে, আর তাদের সঙ্গে তাল রেখে ছুটে চলছে বেবুনগুলো। ওরা আর মাটিতে পা দিচ্ছে না। গাছের লতা ধরে দোল দিতে দিতে ওরাও যাচ্ছে বায়ুবেগে।

থেকে থেকে বেবুনগুলো উৎসাহিত করছে বুঝি উটপাখিদের। উটপাখিরা ভাবছে—বেবুনের দল বুঝি ওদের ধরতে আসছে। তারা তাদের গতি দিলো আরও বাড়িয়ে।

টারজান খেয়াল রাখছে সামনে মাটির দিকে—উটের পায়ের চিহ্ন পড়েছে যে দিকে, সেই দিক দিয়ে চালাচ্ছে সে উটপাখিদের।

এমন সময় উটের পায়ের চিহ্ন গেল মিলিয়ে—সামনে পড়লো ভীষণ জঙ্গল। টারজান বুঝলো—পথ ভুল করেছে সে। বাহন থামালো টারজান—আর সে বাহনটিও হয়ে পড়েছে অত্যন্ত ক্লান্ত। বাহন বদলালো সে—যে উটপাখিটা সঙ্গে সঙ্গে আসছিল, তার পিঠে চেপে ছেড়ে দিল নিজেরটাকে।

এতক্ষণে খেয়াল হলো টারজানের—বেবুনগুলো তো সঙ্গে নেই। ওরা নীলদস্যুদের গায়ের গন্ধ পেয়ে ঠিক পথেই গেছে তাহলে।

উটপাখির মুখ ঘুরিয়ে টারজান আবার ছুটালো ওদের দিকে।

খানিকটা এগিয়ে টারজান দেখলো—ডাইনে আর বাঁয়ে—দু'দিকেই পথ বার করা চলে। সামনে আছে পাহাড়। ডানদিকে তাকিয়ে দেখলো—উটপাখির পায়ের চিহ্ন। বুঝলো—এইটেই সেই সরোবরে যাবার পথ। এইবার সে বাঁ-দিক ধরে চলতে শুরু করলো।

কি আশ্চর্য! বেবুনগুলো কোথায় গেলো—ওদের যে কোন পাত্তাই মিলছে না।

যাকগে—এই একটি ছাড়া যখন দ্বিতীয় কোন পথ নেই, তখন এই পথে গেলেই দস্যুদের দেখা পাওয়া যাবে—এই ভেবে আবার প্রাণপণে পাখিটাকে চালাতে লাগলো।

খানিক পরই দূর থেকে তার কানে এলো—একটানা গোঙানোর শব্দ। তীরধনুক পিঠে রেখে টারজান গেঁজ থেকে হাতে তুলে নিলো তার বিরাট ছোরাটা।

তারপর একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে পড়লো বিরাট এক চিতা। চারটা বেবুন মিলে ওটাকে আক্রমণ করেছে। চিতার গর্জন আর বেবুনদের ক্রুদ্ধ গোঙানোই খানিক আগে টারজান শুনতে পেয়ে তৈরী হয়ে নিয়েছিল।

চিতাটা একটা উটপাখিকে আসতে দেখে বেবুনদের ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়লো নিরীহ পাখির উপর। কিন্তু পাখির ঘাড়ে কামড় দেবার আগে টারজানের ছোরা তার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেলো।

টারজান লাফিয়ে পড়লো পাখির পিঠ থেকে। চিতাটাও তখন টারজানকে একটা মরণ কামড় দেবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো।

টারজান তার আগেই চিতার পিঠে চড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। ফলে বেবুনগুলোও সুযোগ পেয়ে গেলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা চলবে না—ওদিকে দস্যুরা হয়তো অনেকদূর এগিয়ে গেছে। চিতার বুক থেকে ছোরাটা খুলে নিয়ে টারজান সেটাকে গেঁজে পুরলো—তারপর আবার উটপাখির পিঠে চড়ে বসলো।

বায়ুর বেগে ছুটে চললো পাখি—এবার বেবুনগুলো তার সঙ্গে আর তাল রেখে চলতে পারছে না।

টারজান তাকিয়ে দেখলো—মাত্র চারটি বেবুন তার সঙ্গে আছে—বাকীগুলো বুঝি আগেই বেরিয়ে গেছে।

উদ্দামগতিতে ছুটে চলেছে পাখি। এইবার পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তারা—সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, তার পরেই আবার শুরু হয়েছে পাহাড়।

পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়েই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো টারজান—মাঠের শেষ মাথায় নীল পোশাক-পরা দস্যুগুলো আর তাদের পিছন পিছন তাড়া করছে বেবুনের দল। বেবুনের তাড়া খেয়েই বুঝি তারা তাদের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে আবার নীলদস্যুগুলো পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একবার চোখের দেখা পেয়ে টারজান একেবারে খেপে গেলো।

সামনে খোলা মাঠ পেয়ে উটপাখিগুলো তাদের গতি আরও বাড়িয়ে দিলো। তবু টারজান ভাবে, আরও দ্রুত কেন তারা যেতে পারছে না।

মাঠ পার হয়ে আবার পাহাড়। দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে অতি সরু পথ—সোজা চলতে না পারলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়। এই অপরিচিত পথে চলতে গিয়ে উটপাখিদের গতিবেগ কমে আসে—আবার টারজানের উৎসাহ পেয়ে ছুটতে থাকে।

আরও খানিকটা এগুনোর পর পথের বিস্তার বাড়লো—এবার ওরা অনেকটা অক্লেশে চলবার সুযোগ পেলো।

টারজান সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো—নীলদস্যুগুলো আর খুব বেশী দূরে নয়।

উটপাখির পিঠে বসে চলতি অবস্থাতেই এবার তীর ছুঁড়লো টারজান। শোঁ করে বেরিয়ে গেলো তীর। দূর থেকে টারজান

দেখতে পেলো—একজন নীলদস্যুর মাথা থেকে তার নীল পাগড়িটা উড়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো দস্যু—তার হাতের বন্দুক গর্জে উঠলো। চট্‌ ক'রে টারজান শুয়ে পড়লো পাখির পিঠে; তার পিঠের উপর দিয়ে চলে গেলো বন্দুকের গুলি।

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো উটপাখিটা—তারপর ভড়কে গিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো। চট্‌ ক'রে তার পিঠ থেকে টারজান নেমে দাঁড়িয়ে তার মুখটা আবার ঘুরিয়ে দিয়েই পিঠে চড়ে বসলো।

পাখি ছুটলো উদ্দাম বেগে। দস্যুদল এই ফাঁকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উট আর উটপাখির নামে যতই মিল থাকুক না কেন—গতিতে তাদের অনেক পার্থক্য।

টারজান আবার চললো এগিয়ে। দস্যুরা আবার তার তীরের নাগালের মধ্যে চলে এলো। কিন্তু টারজান আর তীর ছোঁড়বার অবকাশ পেলো না—তার আগেই দস্যুদের বন্দুকগুলো একসঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম করে উঠলো।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় টারজানের চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেলো। ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো টারজান। উটপাখিটাও ভড়কে গেলো।

এই ফাঁকে দস্যুরা আবার কিছুটা গেলো। এমনি ভাবে চললো উভয় পক্ষের লুকোচুরি খেলা। দস্যুরা বুঝলো—দৌড়ের পাল্লায় তারা আর উটপাখির সঙ্গে পেরে উঠবে না। তখন তারা পালানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

সোজা রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গলিঘুঁজির মধ্য দিয়ে দস্যুরা চলতে লাগলো।

টারজান এততেও ধৈর্যহারা হয়নি—সমান আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে সে তখনও অনুসরণ ক'রে চলেছে দস্যুদের। মাঝে মাঝে নাগালের মধ্যেও পাচ্ছে—কিন্তু তীর ছুড়তে পারছে না। বরাবরই টারজানের মনে জাগছে—চলতি অবস্থায় ছুঁড়লে তীর যদি ঠিক লক্ষ্যস্থানে না পৌঁছায়—যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নোরা বা টমিকে আঘাত করে।

অকস্মাৎ এলো সুযোগ—সেই মুহূর্তেই টারজান তার সদ্ব্যবহার করলো। তার অব্যর্থ সন্ধানে একটা নীলদস্যু উটের উপর থেকে পড়ে গেলো। তার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলো টমিও।

বাকী তু'জন দস্যু পেছনের দিকে ফিরেও তাকালো না—ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা পালাতে লাগলো।

টারজান থেমে পড়লো। সে উট থেকে নেমে তাড়াতাড়ি টমিকে টেনে তুললো। উট থেকে পড়ে গেলেও টমি কিন্তু একটুও ঘাবড়ায়নি। সে তক্ষুণি উঠে গায়ের ধুলো ঝেড়ে তীর-ধনু তুলে নিলো!

টমি বললো টারজানকে :

'তীর ছুড়বো নাকি ?'

টারজান আদর ক'রে তার পিঠ চাপড়ে বললো :

'থাক্‌গে এখন। চলতো দেখি—নোরাকে আগে উদ্ধার করে আনি।'

টমিও চড়ে বসলো সঙ্গী উটপাখিটার পিঠে। এবার তু'জনে আবার চললো দস্যুদের অনুসরণে।

টারজান যখন টমিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণে দস্যুরা চলে গেছে অনেকদূর—টারজানের নাগালের বাইরে।

টারজান তাকিয়ে দেখলো—সামনে ওদের কেউ নেই। কোন্ ফাঁকে ওরা তাকে ফাঁকি দিয়ে কোন্ দিকে লুকিয়ে পড়েছে। বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লো টারজান। আবার তাকাতে হলো মাটির দিকে—যতখানি সম্ভব সতর্ক দৃষ্টিতে উটের পায়ের ছাপ অনুসরণ ক'রেই এবার চলতে হলো তাকে।

উটপাখির গতি মন্দ হয়ে এলো। তাছাড়া টনিও আছে সঙ্গে। তার পক্ষে টারজানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উদ্দামগতিতে ছুটে চলা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে টারজানকে সমঝে চলতে হলো।

কিন্তু এবার এলো আরো বিপদ্—উটের পায়ের আর কোন ছাপ চোখে পড়ছে না। একেবারেই পাথুরে পথ—মাটি নেই যে পায়ের চিহ্ন দেখে চলতে পারে। তবু সামনে যে পথটা ছিল, তাই ধরেই লে টারজান।

এতক্ষণ ধরে যে অসীম শক্তি, উৎসাহ আর ধৈর্য নিয়ে টারজান নারাকে উদ্ধার করবার জন্যে ছুটে এসেছে—এবার যেন তাও সব াচ্ছে উবে।

হতাশ হয়ে পড়লো টারজান। নীলদস্যুরা এবার নিশ্চয়ই নোরাকে নিয়ে বিক্রি ক'রে দেবে কারো কাছে।

এত দুঃখের ধন—বার বার হারিয়েও তাকে ফিরে পেয়েছে রজান। কিন্তু এবার!

যদি বুনো জন্তু হতো—তাদের মুখ থেকেও সে ছিনিয়ে নিতো ারাকে। কিন্তু এরা যে মানুষ—অন্তরে বুঝি এরা পশুরও অধম।

আর তাছাড়া এ তো আর টারজানের অরণ্যভূমি নয়—মরু-পাহাড়! এর সঙ্গে কোনই পরিচয় নেই টারজানের। কী ক'রে সে খুঁজে বার করবে নোরাকে।

মনে চিন্তার সাগর উত্তাল হয়ে উঠছে, বুঝি বা বাঁধ ভেঙ্গে যায়! কিন্তু তবু দেহে তার বিশ্রাম নেই।

পাগলের মতো সে চালাচ্ছে উটপাখিকে। পাখিটাকে ছেড়ে দিয়েছে সে ওরই ইচ্ছার উপর। পাখিও যেদিকে খুশি ছুটে চলেছে।

অকস্মাৎ আর্তকণ্ঠের চিৎকার আর গুরুগর্জনে পাহাড়ের বুকে জাগলো কাঁপন। পাহাড়ের স্তরে স্তরে সেই মিলিত কণ্ঠ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মুখর ক'রে তুললো আকাশ-বাতাস।

ক্ষণেকের জন্যে কান পেতে রইলো টারজান। শুনতে পেলো—বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ।

সেই শব্দ শুনেই টারজান হাত দু'খানা মুখের কাছে নিয়ে তুললো এক বিরাট ধ্বনি। তারপরই ছুটে চললো সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে।

দূর থেকেই টারজান অবাক্ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো—পাহাড়ের উপর থেকে যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, আর দস্যু দু'জন পাহাড় লক্ষ্য ক'রে এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে।

দস্যুরা এগুতে পারছে না—উটগুলিও ভয় পেয়েছে। আর এই অবসরে নোরা উটের পিঠ থেকে নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে পিছন দিকে।

নোরাকে দেখতে পেয়েই টারজান বিকট গর্জনে তার মনের আনন্দ প্রকাশ করলো।

টারজানের গর্জন কানে যেতেই দস্যুরা ফিরে তাকালো। দেখলো



কুমিরের সঙ্গে টারজানের লড়াই



···এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে। [পৃষ্ঠা—৪৮

নোরা পালাচ্ছে, আর অব্যর্থ সন্ধানী টারজান তার ধনুকে তীর জুড়ছে।

ওরা একবার তাকালো সামনের দিকে—থেকে থেকে এক একবার বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ছে পথের উপর।

দস্যুরা বুঝলো—আর তারা যুঝে উঠতে পারবে না।

চট্ ক'রে উটের পিঠ থেকে নেমেই ওরা পাহাড়ের ভেতর যেন মিলিয়েই গেলো।

যে পথে উট চলে না উটপাখিও চলে না, তেমনি একটা গলিতে ওরা ঢুকে পড়লো।

টারজান বুঝলো—এবার আর ওদের অনুসরণ করা নিরাপদ নয়। আর তাছাড়া সে তার হারানো ধন নোরাকে ফিরে পেয়েছে, টমিকে তো আগেই পেয়েছে। তাই এবার ঘরমুখো হওয়া প্রয়োজন।

এতক্ষণ সে বেবুনদের কথা ভুলে গিয়েছিল। এবার বুঝলো টারজান—এক সময় সে তাদের উপকার করেছিল বলেই এইবার তারাও তার পরম উপকার সাধন করলো।

বেবুনদের ভাষায় টারজান ডাকলো ওদের। পরম আনন্দে ফিরে এলো ওরা। আজকের যুদ্ধে ওরাই জয়ী—নীলদস্যুদের উচিত শাস্তি ওরা দিয়েছে—উপকারীর প্রত্যুপকারও করেছে—এই তাদের আনন্দ।

টারজান, নোরা আর টমি—দুটো উটপাখির পিঠে চড়ে বসলো। ওরা চললো এবার ওদের চেনা পথে, সেই সরোবরের দিকে।

একটু জল না খেয়ে নিলে ওরা আর চলতে পারবে না।

পাঁচ

ঈগলের পিঠে

যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে সভ্যজগতে মানুষ নেতা হয়, বৈজ্ঞানিক হয়, কিংবা কবি হয়, অর্ধমানব টারজানও ছিল সেই প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু সভ্যজগতে মানুষ যে সব সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, টারজানের ভাগ্যে তা ঘটেনি।

বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের গবেষণাগারে বসে যন্ত্র তৈরি করেন —মানুষ সেই যন্ত্রে চড়ে দুনিয়া জয় করতে বেরোয়। টারজানের সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ছিল না—কিন্তু যে বিরাট অরণ্যভূমিতে সে বাস করতো তাই ছিল তার সেই গবেষণাগার। এইখানেই সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, বনজ গাছপালার গুণাগুণ জেনেছে, বন্য পশু-পাখিকে পোষ মানিয়ে তাদের কাজে লাগিয়েছে। আর বুনো মানুষদের অন্তর জয় করে তাদের বনরাজ্যের আর মনোরাজ্যের রাজা হয়েছে।

সভ্য জগৎ থেকে, এমন কি লোকালয় থেকেও বহুদূরে থাকে পাখির রাজা ঈগল। এক সময় টারজান তার অসাধারণ বুদ্ধির সহায়তায় ধরে এনেছিলো একটা ঈগল আর একটা ঈগলের বাচ্চা।

বহুদিন ধরে ওই দু'টোকে লালনপালন করে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নিয়েছিলো টারজান। বনে চরতে শিখে টারজান বনের পশুদের হার মানিয়েছিল, গাছে চড়তে শিখে বানরদের পেছনে

ফেলেছিল, জলে সাঁতার কাটতে শিখে কুমিরদের সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে—আর এবার ঈগলকে পোষ মানিয়ে আকাশ জয়ের বাসনা জাগলো তার মনে।

সভ্য মানুষের বিমানের চেয়েও টারজানের ঈগল অনেক বেশী সহায়ক, অনেক বেশী কাজের। ঈগলের পিঠে চড়ে সে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়—কখন কখন টমি আর নোরাকে নিয়ে আকাশে বেরোয়।

বাচ্চা ঈগলটা টারজান দিয়েছে টমিকে। টমি আদর ক'রে তার নাম দিয়েছে ঈগলু। টমিই তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে—তার লালনপালন করে।

কিন্তু টমির মনে বড় অস্বস্তি তার ঈগলু এখনো তাকে পিঠে নিয়ে উড়তে শেখেনি। একদিন অধীর হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো টারজানকে :

'আমার ঈগলু কবে বড় হবে—আর আমাকে নিয়ে উড়ে বেড়াবে ?'

টারজান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে :

'এই তো ঈগলু বড় হয়ে গেছে—ওকে ভালো ক'রে খাবার দাও, দেখবে ক'দিনের মধ্যেই ওটা তোমাকে নিয়ে উড়ে বেড়াবে।'

সেদিন থেকে টমির আর অন্য কাজ নেই। সে কেবল মাছ ধরে বেড়ায়, আর সেই মাছ তুলে দেয় ঈগলের মুখে।

টারজান তাকে বারবার সাবধান ক'রে দিয়েছে :

'তুমি সারাদিন বনে-বাদাড়ে অমন ক'রে ঘুরে বেড়িও না। মংড়ুকে বলে দিয়ো—সেই তোমার ঈগলুর খোরাকির ব্যবস্থা করবে।'

মংডু হলো একটা বুনো—টারজানের অত্যন্ত অনুগত, টারজানের বাড়িতেই থাকে আর সারাদিন তার ফাই-ফরমাস খাটে। মংডুই এরপর থেকে ঈগলুর জন্যে মাছের বন্দোবস্ত করে।

কিছুদিন পর একদিন টারজান নিয়ে এলো ঈগলুর পিঠে পরানোর সাজ—আর তা' দেখে টমি তো খুশিতে ডগমগ! তক্ষুণি সে ওটাকে ঈগলুর পিঠে চাপানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

টারজান হেসে তার পিঠ চাপড়ে বললো :

'ধীরে! ধীরে! এত তাড়াহুড়া করো না। আস্তে আস্তে ওকে এটা সইয়ে নাও।'

তারপর থেকে টমি রোজ একবার দু'বার করে ঈগলুর পিঠে সাজ পরায় আর পরমানন্দে তার পিঠে চড়ে বসে থাকে।

একটা কাঠের দাঁড়ার সঙ্গে শিকল দিয়ে আট্‌কে রাখা হয় ঈগলুকে। টারজান টমিকে বারবার বলে দিলো :

'টমি, একটা বিষয়ে কিন্তু সাবধান হবে। ওর পিঠেই চড়ো আর যাই করো—ভুলেও কিন্তু কখনও ওকে শিকল-ছাড়া করো না। আমি ওকে শেখাচ্ছি—শেখানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওকে কখনও ছাড়া চলবে না—কথাটা মনে রেখো।'

টারজান কয়েকদিনের জন্যে গেছে শিকারের নেমন্তন্ন পেয়ে। কয়েক মাইল দূরবর্তী বুনোদেরই একটা গাঁ—সেই গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে টারজানের খুবই বন্ধুত্ব। তারই সাদর আহ্বানে টারজান গেছে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। গেছে তারই অতি সাধের ঈগলের পিঠে চড়ে।

বাড়িতে রইলো নোরা, টমি আর মংডু। মংডু সকালবেলা



টারজান গেছে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে তারই অতি সাধের ঈগলের পিঠে চড়ে। [পৃষ্ঠা—৫৩

বেরিয়েছে মাছের সন্ধানে। আগের দিনের মাছ ছিল—সেই মাছেই এবেলার খোরাকি চলবে, কিন্তু ওবেলার জন্যে তো মাছ চাই! তাই গেছে মংড়ু।

টমি আগের দিনের মাছগুলি নিয়ে নিজেই খাওয়ালো ঈগলুকে। তারপর তার পিঠে সাজ পরিয়ে বসলো চড়ে।

ঈগলুরও মস্তা আনন্দ। পেট পুরে সে খাবার খেয়েছে।

প্রথম প্রথম যখন টমি তার পিঠে চড়তো, তখন সে ডানা ঝাপটাতো। কিন্তু এখন টমিকে নিয়ে নিয়ে তার অভ্যাস হয়ে গেছে—সে আর আপত্তি করে না।

টমি তার পিঠে বসে বেশ কায়দা করে পা দু'খানা দিয়ে ঈগলুর পেট চেপে ধরলো, বাঁ হাত দিয়ে ধরলো ঈগলুর পিঠের সাজ, আর ডান হাতে ধনুকটা ঈগলুর মাথায় ঠুকে ঠুকে বলতে লাগলো ঃ

'চলরে ঘোড়া জোর কদম।'

টারজান ঈগলের পিঠে চড়ে যা' করে, টমিও করলো তাই, আর সঙ্গে সঙ্গে—

সঙ্গে সঙ্গেই ঈগলু তার দু'খানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে ঝাপটাতে লাগলো। টমি প্রায় পড়ো পড়ো অবস্থায় তার সাজটা জাপটে ধরে চিৎকার করতে লাগলো ঃ

'আরে থাম্ থাম্! পড়লুম যে!'

একটা হ্যাঁচকা টান—ঈগলু দু'পাখা ছড়িয়ে এক ধাক্কায় উঠে গেলো অনেকটা উপরে—তার পায়ে রইলো শিকলের খানিকটা অংশ ঝুলে।

মহা বিপদে পড়লো টমি। এমন জানলে সে কি আর অমন

কায়দা-কসরত করতো। এখন উপায় কি? সে শুধু চিৎকার করে বলতে লাগলো ঃ

'আরে শীগ্গির নাম—এক্ষুণি যে পড়ে মরবো।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। আকাশে যার একাধিপত্য থাকবার কথা—সে তো দীর্ঘকাল বন্দিত্ব স্বীকার করেছে! এইবার যখন সে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, তখন সে প্রাণ ভরে তা' ভোগ ক'রে নেবে।

ঈগল ক্রমাগত উপরের দিকে উঠতে লাগলো—অনেকটা উপরে উঠে এইবার চললো সে সোজা সামনের দিকে।

টমির মনে পড়লো—টারজান কিভাবে বড় ঈগলটাকে নামাতে শিখিয়েছিলো। সেও টারজানের মতো ক'রে ধনুটা ঈগলুর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো ঃ

'এবার নামতো রে ঈগলু।'

কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য! বড় ঈগল টারজানের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে, ঈগলু যে এখনো তা' পায়নি। কাজেই টমির সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেলো।

টমি এবার সব আশা ছেড়ে দিলো। সে বুঝতে পারলো—টারজান কেন বারবার তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলো। আর এও বুঝলো—কত কষ্ট করে টারজান এদের শেখাচ্ছিল।

থাকগে, আর ভাবনা চিন্তা ক'রে লাভ নেই। কপালে যা আছে তাই হবে। টমি কখনও ভয় পেতে শেখেনি। সে কেবল দুই হাতে ঈগলুর সাজটা ধরে আছে বেশ জোর ক'রে—যেন না আবার পড়ে যায়।

আর এত উঁচু থেকে যদি সে পড়েই যায়, তবে আর বাড়ি ফিরে যেতে হবে না কোন দিন।

হঠাৎ গরমটা যেন অসহ্য হয়ে উঠলো। নীচের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারলো না টমি। মাটি থেকে অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছে—তাই নীচের জিনিস অনেক ছোট বলে মনে হচ্ছে।

মাটির বুকে যে কোন গাছপালা আছে, তা' মনে হলো না। ধূধূ করছে মাঠ, তারই মাঝে মাঝে যেন আবছা সবুজের চিহ্ন মাত্র দেখা যায়।

হঠাৎ মনে হলো টমির—এই বুঝি তবে সেই মরুভূমি! পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো—সবুজ বনানী ক্রমে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। তাহ'লে নীচে যে মাঝে মাঝে সবুজ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে—এগুলি বুঝি মরুভূমির কাঁটা গাছ—উটদের প্রিয় খাদ্য।

আর মরুভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছে বলেই বুঝি এত গরম লাগছিল।

টমি ভাবছিল : ঐখানেই যদি ঈগলুটা নামে, তবে কি দুর্গতিই না হবে!

না, ঈগলু এখানে নামবে না। যা গরম, তার পক্ষেও এ জায়গা খুব আরামের হবে না।

তবে কোথায় নামবে ঈগলু! কোথায় সে নামবে তা' টমিও জানে না। তবে এটা সত্যি যে, চলতে চলতে ঈগলু যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন যেখানেই হোক, এক জায়গায় নামবেই।

এই তো গরম অনেকটা কমে এসেছে। নীচের দিকে তাকিয়ে

দেখলো টমি—মরুভূমি ওরা পার হয়ে আসছে। এখান থেকে শুরু হয়েছে জলাভূমি।

আঁতকে উঠলো টমি। তাহ'লে এইটাই বুঝি সেই জলাভূমি যার পর থেকে শুরু হয়েছে আজব দেশ! কী সর্বনাশ সে কতদূর চলে এসেছে! আবার ফিরবে কি ক'রে?

আর ঈগলু যদি সেই আজবদেশেই চলে যায়? যেখানে—

ওরে বাবা! এ আবার কি? অনেকগুলো রাক্ষুসে পাখি এক সঙ্গে উড়ে আসছে যে ওদের দিকেই। সর্বনাশ!

টমি কেবলই চেঁচাতে লাগলো :

'লক্ষ্মী সোনা ঈগলু আমার—শীগ্গির আরো উপরে উঠে যাও, নইলে ঐ রাক্ষুসে পাখিগুলো তোমায় আমায় একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

কিন্তু ঈগলু তো আর টমির কথা বোঝে না। এমন কি, যে সবনাশের রূপ ধরে এগিয়ে আসছে রাক্ষুসে পাখিগুলো তাদের সম্বন্ধেও সে সচেতন নয়। চলছে সে আপন মনে।

ঈগলু চলেছে সোজা সামনের দিকে। এরি মধ্যে দু' একটা রাক্ষুসে পাখি এসে টমির গায়ে ডানার ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে। টমি ধনুক দিয়ে যতখানি সম্ভব আত্মরক্ষা করতে লাগলো।

এমন কি ঐ অবস্থাতেই সে ধনুক থেকে এলোপাতাড়ি দু'একবার তীরও ছুঁড়েছে—কিন্তু তাতে ফল কিছু হয়নি।

ক্রমে পাখিরা আরও বেশী সংখ্যায় ঈগলুর চারদিক ঘিরে ফেলতে লাগলো। ঈগলু বিব্রত হয়ে ডানার ঝাপটা দিয়ে তাদের তাড়াতে চেষ্টা করলো।

তখন পাখিগুলো উড়ে উড়ে যেতে লাগলো ঈগলুর সামনে। ঈগলুর পথ রোধ করে তারা উড়তে লাগলো।



ঈগলুর পথ রোধ করে তারা উড়তে লাগলো।

টমি বার বার ঈগলুর মাথায় ধনুক ঠুকে ঠুকে ইঙ্গিত করতে লাগলো উপরের দিকে উঠবার জন্যে। কিন্তু ঈগলু তখন বেপরোয়া হয়ে গেছে। সে ডানার ঝাপটা দিয়ে ঠোঁটে আঘাত ক'রে ঐ রাক্ষুসে পাখিগুলোকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু অসংখ্য শত্রু-পরিবেষ্টিত ঈগলুর পক্ষে দীর্ঘক্ষণ যুঝে যাওয়া সম্ভব হলো না।

তারপর এক সময় কিছুটা ক্লান্ত হয়ে ঈগলু ডানা দু'টো গুটিয়ে নিলো—আর সঙ্গে সঙ্গে সে নীচের দিকে নেমে যেতে লাগলো।

এবার ভয় পেয়ে গেলো টমি। সে জাপটে ধরলো ঈগলুকে। পাখিদের ভয় আর নেই—কিন্তু কোথায় কীভাবে যে তারা মাটিতে পড়বে—তা' ভেবেই টমি দু'চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো।

যখন প্রায় মাটির কাছাকাছি চলে এসেছে ঈগলু, তখনি স্বাভাবিক সংস্কার বশেই সে পাখা দু'খানা মেলে ধরলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য চলেছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। ঈগলুর একটা ডানা আটকে গেলো একটা গাছের ডালে। ঈগলু কাত হয়ে পড়লো।

এতক্ষণ পর্যন্ত টমি সামলে ছিলো—কিন্তু এবার আর সামলাতে পারলো না। সে ঈগলুর পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো একটা ঝোপের মধ্যে।

* * *

মংডুর চোখেই প্রথম পড়লো। বিল থেকে চুবড়ি বোঝাই মাছ এনে মংডু দেখলো—ঈগলু নেই। যে দাঁড়টার উপর সে বসে থাকতো—সেটা খালি পড়ে আছে। দেখেই তার চক্ষু স্থির!

তাহ'লে টমিই বোধ হয় এটাকে খুলে দিয়েছে!

কিন্তু টারজান তো বারবার নিষেধ করেছিলো টমিকে—সে যেন ভুলেও কখন ঈগলুকে শিকল-ছাড়া না করে। টমি কি টারজানের কথা না শুনেই এমনটি করেছে?

হঠাৎ মংডুর মনে জাগলো কথাটা! ঈগলু যখন উড়ে গেছে, তখন টমি তো তার পিঠে ছিলো না!

ভাবতে গিয়ে মংডুর বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠলো। সে মাছের চুপড়ি ফেলে রেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো বাড়ির দিকে! নোরাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো মংডু:

'মেমসাহেব—টমি কোথায়?'

'টমি? সে তো অনেকক্ষণ ঘরে নেই! কোথায় বুঝি বনবাদাড়ে বেরিয়েছে!'

মংডু বললো:

'তাহ'লে বোধহয় সর্বনাশ ঘটে গেছে। ঈগলুও তার জায়গায় নেই।'

নোরা মংডুর সঙ্গে ছুটে গেলো সেই দাঁড়ের কাছে। দাঁড়ের ভেতরটা ঘুণে খেয়ে রেখেছে—একদম ফাঁপা। তাতে শিকলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো দু'জনেই। টমি নিশ্চয়ই ঈগলুর পিঠে বসেছিলো—আর পাখিটা যা ছটফট করে। নিশ্চয়ই সেই ছটফটানির চোটেই ঘুণে-ধরা দাঁড় থেকে শিকলটা গেছে ছুটে—আর ঈগলুও টমিকে পিঠে নিয়ে উড়ে গেছে।

এইবার মংডু ছুটলো সেই বুনোদের গাঁয়ে—যেখানে টারজান গেছে নেমন্তন্ন রাখতে।

বনবাদাড় ভেঙে ছুটে চলেছে মংডু। এখুনি টারজানকে খবর না দিলে সর্বনাশ ঘটবে।

ছয়

টমির সন্ধান

মংড়ুর গোটা একটা দিন লেগে গেলো টারজানের কাছে খবর নিয়ে পৌঁছাতে। বনবাদাড় ভেঙে একটুও না থেমে, সারাদিন ধরে দৌড়ে মংড়ু গিয়ে পৌঁছালো সেই বুনোদের রাজ্যে—যেখানে টারজান নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়েছিল। তারপর ওখানকারই একটি লোক সঙ্গে নিয়ে মংড়ু পৌঁছালো তাদের মোড়লের বাড়িতে।

মংড়ুকে দেখেই টারজান একটা কিছু দুঃসংবাদ আশঙ্কা করেছিল। তারপর টমি আর ঈগলুর নিরুদ্দেশের সংবাদ শুনে টারজান আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না। তখুনি মংড়ুকে পাঠিয়ে দিল বাড়িতে নোরার কাছে—আর নিজে চড়ে বসলো ঈগলের পিঠে।

বুনোরাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, তার হাতে হাত রেখে বিদায় নিলো টারজান।

দেখতে দেখতে ঈগল উঠে গেলো অনেক উপরে—এখন আর নীচে থেকে ঈগলের পিঠে টারজানকে দেখা যায় না। আর টারজান নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো—মানুষগুলি যেন খেলার পুতুলের মত ছোট।

শোঁ শোঁ করে উড়ে চলছে ঈগল—তার পিঠে বসে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে টারজান—নীচে কোথাও যদি ঈগলু কিংবা টমিকে দেখা যায়।

নীচের দিকে টারজান তাকিয়ে দেখলো—বিরাট্ বিশাল অরণ্যানা —এর মধ্যে যদি কোথাও ওরা পড়ে গিয়ে থাকে, তবে আর তাদের পাত্তা পাবার কোন ভরসা নেই। নীচের দিকে তাকালে শুধুই সবুজ আর সবুজ—যেন ধরার পিঠে সবুজ গালিচা পাতা রয়েছে।

ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগলো তারা—ক্রমে সবুজের সমারোহ কমে আসতে লাগলো। অরণ্য অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে এখানে।

টারজান ভাবলো ঃ

ঈগলুর শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি—কাজেই টমি নিশ্চয়ই একে ইচ্ছামত চালাতে পারবে না। তবে ঈগলু কোথায় নামবে?

—কোথায় যে নামবে—তাই তো ভাবনা। টারজানের মনে হলো—যে পর্যন্ত ক্লান্ত না হবে, সে পর্যন্ত ঈগলু নিশ্চয়ই নামবে না।

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো টারজান—দূরে দূরে গাছগুলি সব দাঁড়িয়ে আছে। একবার মনে হলো টারজানের—হয়তো টমি এতক্ষণে গাছের লতা ধরে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে যাচ্ছে বাড়ির দিকে।

গাছপালার সঙ্গে ব্যবধানটা ক্রমেই কমে আসতে লাগলো—টারজান নেমে এলো নীচে। সারাদিন ধরে চারদিক একেবারে চষে ফেলেছে। রাতের অন্ধকার এগিয়ে আসছে—আর সামনেই মরুভূমি। কাজেই টারজান বিশ্রামের জন্যে ওখানে একটা জায়গা দেখে নিলো।

পরদিন সকালে টারজান আবার চড়ে বসলো ঈগলের পিঠে। সারাদিন ধরে সে শুধু মরুভূমির উপর ঘুরেছে—যদি কোথাও এখানে তারা পড়ে গিয়ে থাকে!

কিন্তু বৃথা চেষ্টা—তাদের কোনই সন্ধান পাওয়া গেলো না।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই মরুভূমি পার হয়ে টারজান পৌঁছালো জলা-ভূমির ধারে—এখানেই সে রাত কাটাবে।

টারজানের মনে হলো—এই বিরাট জল-জঙ্গল পার হলেই সেই আজব দেশ। অনেকদিন সে আজব দেশে যাবার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। যদি টমিকে সে খুঁজে পায়, তবে আর একবার আজব দেশ সে ঘুরে আসবে।

পরদিন সকালবেলা উঠে জলা থেকে মাছ ধরে খাওয়ালো সে ঈগলকে। আজও সারাদিন তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে জল-জঙ্গল।

টারজান চেপে বসলো ঈগলের পিঠে। পেট বোঝাই ঈগলের—পরম আনন্দে সে টারজানকে পিঠে নিয়ে উড়ে চললো। ঈগলটা ঐ জল-জঙ্গলা জায়গার উপর বার বার ঘুরতে লাগলো। কোথাও যদি দেখা যায় টমি কিংবা ঈগলুকে।

অকস্মাৎ দূর থেকে মনে হলো যেন ধোঁয়া উড়ছে। টারজান ভালো করে চোখটা রগড়ে নিলো। না, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—ধোঁয়াই তো!

তবে কি বনে আগুন লেগেছে! নাঃ—দাবাগ্নি এটা হতেই পারে না!

চট করে টারজানের মনে হলো—এটা কোন সংকেত নয়তো!

এখানে কোন মানুষ থাকবার কথা নয়—তবে ধোঁয়া আসবে কেন?

ধোঁয়া লক্ষ্য করে এবার ছুটে চললো টারজানের বাহন ঈগল।



টারজানের কথা শুনে বেবুনেরা মহা খুশী। তারা তখুনি টারজানকে আমন্ত্রণ জানালো তাদের গুহায় যাবার জন্যে।

ধোঁয়া ক্রমশঃ অনেকটা নিকটে বলে মনে হলো। ঘুরে ঘুরে নামতে লাগলো ঈগল।

ঈগলের পিঠ থেকেই টারজান দেখতে পেলো—একটা জায়গায় আগুন জ্বলছে। আর তা' থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে উপরে।

সেই অগ্নিকুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে আছে এক শিকারী। মুখভরা তার পাকা গোঁফ দাড়ি আর পরণে একটা বাঘের ছাল। হাতে একটা বন্দুক—কিন্তু তার ডগায় একটা ধনুক লাগানো।

ঘুরতে ঘুরতে ঈগলটা নেমে এলো অগ্নিকুণ্ডের কাছে। টারজান বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে নামলো ঈগলের পিঠ থেকে।

শিকারীটিও অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে টারজানের দিকে।

শিকারীটি নিজে নিজেই বল্‌তে লাগলো ঃ 'এ যে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি নে! এ কি বিস্ময়!'

অবাক্ হলো টারজানও। এই নির্জন অরণ্যের শিকারী—সেও যে কথা বলছে টারজানেরই ভাষায়!

টারজান এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো শিকারীকে। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'কে তুমি বন্ধু! এই নির্জন অরণ্যে বাস করছো! আর কেনই বা তুমি ধোঁয়ার সংকেত জানালে বন্ধু!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিকারীটি বলতে লাগলো ঃ

'আমার নাম রবিন্ রয়। আমি ছিলাম এক ইঞ্জিনীয়ার। সোনার খনি আবিষ্কার করবার জন্যে বেরিয়েছিলাম এরোপ্লেন নিয়ে। তারপর ঐ পাহাড়টার ধারে ঘটলো এক দুর্ঘটনা। এরোপ্লেন নিয়ে

পড়ে গেলুম নীচে। দৈবক্রমে আমি রক্ষা পেয়ে গেলুম—কিন্তু এরোপ্লেনটা গেলো একেবারেই ভেঙে। তারপর থেকে—এই তিন বছর ধরে চলছে আমার নির্জনবাস। জন-প্রাণিহীন এই বিরল অরণ্যে একলাই আছি। সারাক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখি এখানে—যদি ধোঁয়া দেখে কোন সহৃদয় ব্যক্তি এখানে এরোপ্লেন থামিয়ে আমাকে উদ্ধার করে সেই ভরসায়।'

অবাক্ হয়ে গেলো টারজানও। জীবনের একটা বিরাট্ অংশ সেও তো একলা কাটিয়েছে অরণ্যের বুকে। কিন্তু তার নির্জনতার কোন বোধই ছিল না। সারা জীবন যে মানুষের সঙ্গই পায়নি—তার আর নির্জনতা কিসের! কিন্তু এই রবিন্ রয় তো সারা জীবন কাটিয়েছে সভ্য জগতে—এই তিন বছর কি করে সে কাটালো এখানে!

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো টারজান:

'এই তিন বছরের মধ্যে কোন মানুষেরই মুখ দেখনি তুমি?'

মৃদু হেসে বললো ইঞ্জিনীয়ার রবিন্ রয়:

'সত্যি কথাই বলছি বন্ধু! এই তিন বছর কোন মানুষই আমার এখানে আসেনি! মাত্র—হ্যাঁ, মাত্র তিন দিন হলো—ছোট্ট একটা ছেলে, বুঝি স্বর্গ থেকেই ছিটকে পড়লো এখানে—আমার এই তাঁবুর সামনে।'

চঞ্চল হয়ে উঠলো টারজান। সে দু'হাতে ইঞ্জিনীয়ারের হাত দুটো চেপে ধরে চিৎকার করে বলে উঠলো:

'সত্যি বলছো বন্ধু! ছোট্ট একটা ছেলে? আমার ছেলে? টমি?'

তাকে শান্ত করে রবিন্ রয় বললো ঃ

'আস্তে বন্ধু, আস্তে! এতো উতলা হয়ো না। তোমারই ছেলে স—টমি—তোমারই মতো ঈগলের পিঠে চড়ে বেরিয়েছিলো সে!'

আর সইতে পারছে না টারজান! আকুল কণ্ঠে সে বলতে াগলো ঃ

'কোথায় আছে সে বন্ধু! শীগ্‌গির ডাকো তাকে। আমি আর হ্য করতে পারছিনে।'

চিৎকার করে ডাকলো রবিন্ ঃ

'টমি! কোথায় তুমি—শীগ্‌গির এসো। দেখ কে এসেছে!'

দূর থেকে সাড়া দিল টমি ঃ

'এই যে আমি! যাচ্ছি রয়।'

একটা পাত্রের দিকে তাকাতে তাকাতে টমি সেখানে এসে ˈপস্থিত হয়ে বললো ঃ

'আজকে নুড়ি পাথরের মধ্যে তিনটে ভারী চকচকে জিনিস পয়েছি রয়!'

টারজানের মুখে হাসি ফুটলো। সে হেসে বললো ঃ

'কোথায়? দেখি তো কী আছে তোমার ঐ বাটিতে?'

টমি এতক্ষণ আর সামনের দিকে তাকায়নি। হঠাৎ গলার াওয়াজ শুনে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলো—হাসিমুখে সামনে াড়িয়ে আছে টারজান।

কোথায় রইলো বাটি, নুড়ি পাথর আর কোথায় রইলো সেই কচকে জিনিস। দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সব কিছু টমি একেবারে াপিয়ে পড়লো টারজানের বুকে।



হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে টারজান। [পৃষ্ঠা—৬৭

অনেকক্ষণ টারজানের বুকে মুখ লুকিয়ে রেখে টমি বললো :

'আমি ঠিক জানতুম—তুমি আমাকে খুঁজে বার করবেই। সেই কথাই তো আমি বলছিলাম রয়কে।'

টারজান বললো :

'আর তুমি তো দেখছি এখনই একজন আবিষ্কারক হয়ে গেছো —নয়? চল তো দেখি—তুমি কি এনেছো?'

এইবার রবিন্ রয় টারজানকে বলতে লাগলো তার নিজের কাহিনী। কী ভাবে সে একলাই ঘুরে ঘুরে প্রচুর সোনা আহরণ করেছে—কিন্তু নির্জন এই অরণ্য-প্রদেশে এই বিরাট্ স্বর্ণস্তূপের কোনই মূল্য নেই—এই ভেবে তার অধিকাংশই সে ফেলে দিয়েছে।

রবিন্ রয় টারজানকে এবার নিয়ে গেলো তার কুটিরে। কুটিরের ভিতরে গাছের ডালপালা আর লতাপাতা দিয়ে একটা খাটিয়া তৈরি করা হয়েছে। তার উপর নানা ধরনের অনেকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র।

অবাক্ হয়ে টারজান জিজ্ঞেস করলো :

'এ সব পেলে কোথায়?'

হেসে বললো রবিন্ :

'আমি বলিনি যে আমি একজন ইঞ্জিনীয়ার? আমার ভাঙ্গা এরোপ্লেনটার দেহ দিয়ে এই সব করে নিয়েছি নিজেই।'

এবার বন্দুক-ধনুটার দিকে তাকিয়ে টারজান জিজ্ঞেস করলো :

'আর এটা ?'

রবিন্ বললো ঃ

'এটাও নিজেই তৈরি করেছি। বন্দুকের মত ঘোড়া টিপেই তীর ছোঁড়া যায়। বড় কাজের জিনিস। অবশ্য পিস্তলও আমার আছে। কিন্তু পারতপক্ষে গোলাগুলি খরচ করিনে বলে সেটা তোলাই আছে। ভবিষ্যতে আরও বিপদের জন্যে এর হয়তো প্রয়োজন ঘটতে পারে।'

বাইরে বেরিয়ে এলো তারা দু'জন। খানিকটা দূরে একটা উঁচু মাটির ঢিবির উপর ঈগল দু'টা বসে আছে। আর টমি তাদের সঙ্গে খেলা করছে !

রবিন্ রয় বললো ঃ

'জানো বন্ধু ! তুমি না এলে হয়তো আমার আর কোন দিনই সভ্য জগতে ফিরে যাওয়া হতো না—যে কয়টা দিন বেঁচে আছি, এখানেই কাটিয়ে দিতে হতো।'

বিস্মিত হয়ে টারজান জিজ্ঞেস করলো ঃ

'কেন, ঐ যে সামনে পাহাড়টা রয়েছে—ওটা ডিঙ্গিয়ে তারপর এগিয়ে গেলেই তো হ'তো।'

হেসে উত্তর করলো রবিন্ রয় ঃ

'তা হ'তো না বন্ধু ! একদম খাড়া ঐ পাহাড়। কয়েকবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু কিছুতেই চড়া যায় না।'

রবিন্ বলতে লাগলো ঃ

'ঐ টমিকে ঈগলের পিঠে চড়ে আসতে দেখে ভেবেছিলুম, ওর পিঠে চড়ে যদি পাহাড় পার হওয়া যায় ! কিন্তু ওটা বড় বাচ্চা—

আমার ভার সইতে পারে না। অবশ্যি পড়ে গিয়ে ওর ডানায় যে আঘাত লেগেছিল, তা সেরে যাওয়ায় ও সম্পূর্ণ সুস্থই আছে।'

খানিক ভাবলো টারজান। তারপর জিজ্ঞেস করলো তাকে:

'তুমি কোথায় যেতে চাও বন্ধু!'

'কোথায়? যে কোন জায়গায়। এতদিন ধরে এখানে থেকে অস্থির হয়ে পড়েছি। যেখানে মানুষের মুখ দেখতে পাবো, সেখানেই যেতে রাজী আছি। আমার সঙ্গে আছে বোধ হয় লাখ টাকার সোনা—এই সব নিয়েই আমি সভ্য জগতে ফিরে যেতে চাই।'

এমন সময় টমি দৌড়ে এসে নালিশ জানালো টারজানের কাছে:

'ঈগলুর ডানা ভাল হয়ে গেছে—তবু ওটা উড়তে চাইছে না—একে বাড়ি নিয়ে যাবো কি করে?'

শান্ত স্বরে টারজান বললো:

'তার জন্যে চিন্তা নেই। আমার ঈগল যখন উড়তে শুরু করবে, তখন তোমার ঈগলুও চুপ করে বসে থাকবে না। দেখবে'খন, সেও সঙ্গে সঙ্গে উড়তে থাকবে।'

খুশী হয়ে টমি চলে গেলো পাখিগুলির কাছে। টারজান আর রবিন্ আবার কথা বলতে লাগলো।

টারজান বললো:

'কিন্তু এ যে ভারী মুশকিল হলো বন্ধু! তুমি, আমি—আমরা দু'জন, আর তার সঙ্গে তোমার এতগুলি সোনা—এই সব নিয়ে তো আমার ঈগল এতদূর যেতে পারবে না! এর ওজন তো বড় কম হবে না।'

চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো রবিন্ রয় ঃ

'তবে উপায় কি ? আমি কি এখানেই থাকবো ?'

তাকে অভয় দিলো টারজান ঃ

'না না, তাও কি হয় ! পথ একটা বার করবো ঠিকই ।—আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না ?'

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে ইঞ্জিনীয়ার ঃ

'কি ?'

টারজান বললো ঃ

'চেষ্টা করলে আমার ঈগল আমাদের দু'জন আর সোনার তাল সুদ্ধ পাহাড়টা ডিঙোতে পারবে। তারপর টমি ঈগল দুটোকে নিয়ে চলে যাক্ বাড়ি। আর আমি তোমাকে আজব দেশের রাজধানীতে পৌঁছে দেব !'

আনন্দে লাফিয়ে উঠলো রবিন্ রয় ! সে টারজানকে জড়িয়ে ধরে বললো ঃ

'হাজার ধন্যবাদ বন্ধু ! ঐ রাজধানী পর্যন্ত যদি পৌঁছুতে পারি —তবে সেখান থেকে একটা এরোপ্লেন ভাড়া করেও আবার দেশে ফিরে যেতে পারবো ।'

হেসে বললো টারজান ঃ

'তা আর হবে না বোধ হয় !'

ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে রবিন্ রয় ঃ

'কেন বল তো !'

টারজান উত্তর দিলো ঃ

'সে যথাসময় বুঝবে'খন ।'

তারপর দু'একদিন টারজান আর রবিন্ রয় দু'জনে মিলে ঈগলের পিঠে চড়ে বেড়াতে লাগলো। ফলে ঈগলের পক্ষেও ওদের দু'জনকে ব'য়ে নেওয়ার কিছুটা অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেলো।

প্রথম দিন রবিন্ তো ঈগলের পিঠে চড়ে আশ্চর্য হয়ে গেলো।

সে বললো ঃ

'এ তিন বছর ধরে এই নির্জন অরণ্যে বাস করে নিত্যি নতুন আর বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু আজকের এ ঘটনা—ঈগলের পিঠে চড়ে বেড়ানো, আমার জীবনের বিচিত্রতম ঘটনা।'

তারপর একদিন সকালবেলা অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তারা তৈরী। রবিন্ কিন্তু সোনার টুক্রা সবগুলিই ব্যাগে বোঝাই করে পিঠে ঝুলিয়ে নিলো। আর সঙ্গে নিলো কিছু অস্ত্রশস্ত্র।

টারজান আর রবিন্ রয় চড়লো বড় ঈগলের পিঠে আর টমি চড়লো ঈগলুর পিঠে।

খুব বেশী সময় লাগলো না সেই খাড়া পাহাড়টা ডিঙোতে। দুপুরবেলা তারা ওখানে পৌঁছে গেলো।

তারপর ঈগলের পিঠ থেকে নেমে এলো তারা। টমিও নেমে এলো ঈগলুর পিঠ থেকে।

এবার টমি চড়লো বড় ঈগলটার পিঠে। সেই তাকে বাড়ি পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে। আর ঈগলু যাবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

টারজান টমিকে যথাযথ উপদেশ দিয়ে বিদায় জানালো—

কয়েক মিনিটের মধ্যেই টমি ঈগল দুটোকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো—জনহীন অরণ্যে রয়ে গেলো টারজান আর রবিন্ রয়।

সাত

আজব দেশে

টমি চলে যাবার পর টারজান অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো ওদিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো ঃ

'চলো রয়, এবার নিজেদের পথ খুঁজি !'

দু'জনেই চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। কোন্ পথে গেলে সুবিধে হবে তার মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়ে টারজান আর রবিন্ রয় এগুতে লাগলো সামনের দিকে।

অতি সন্তর্পণে, অতি সতর্ক দৃষ্টিতে তাদের পথ চলা শুরু হলো।

রবিন্ রয় যে অঞ্চলটায় ছিলো, সেই অঞ্চলটা ছিল একেবারে জনবসতিশূন্য। চারদিকে খাড়া পাহাড়—সেই পাহাড় ডিঙোনো মানুষের অসাধ্য। তাই কোন দিন কোন মানুষ নিজের চেষ্টায় সেখানে যেতে পারেনি। নেহাৎ দৈবাৎ বিমান-দুর্ঘটনায় সেখানে গিয়ে পড়েছিলো রবিন্ রয় আর ঈগল-দুর্ঘটনায় পড়েছিল টমি।

কিন্তু এখন তারা যে অঞ্চলে এসে পড়েছে—নরমুণ্ড-শিকারী বুনোরা মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আসে পশুশিকারে। আর কিছুট এগুলে তো ওদেরই রাজত্ব।

তাই তারা চলছিল অতি সন্তর্পণে। টারজান আজন্ম বনে লালিত-পালিত—বুনো পশুদেরই মতো তারও আছে ঘ্রাণশক্তি অতি দূর থেকেই টারজান তাদের উপস্থিতি টের পায়।

একটা দিন চলে গেলো—ক্বচিৎ দু'একটা হরিণ বা চিতা ছাড়া অন্য কিছু তাদের চোখে পড়লো না।

পরদিন সকালে আবার রওনা হলো আজব দেশের উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রথম থেকেই টারজান কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে; তার যেন মনে হতে লাগলো—কোথাও একটা কিছু অশুভ ইঙ্গিত সে পাচ্ছে।

রয় কী যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল টারজানকে; কিন্তু টারজান ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে তাকে কথা বলতে নিষেধ করলো। তারপর চুপি চুপি বললো ঃ

'চুপ! কাছে ধারে কোথাও যেন শত্রু রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন ওদের গন্ধ পাচ্ছি।'

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলো রবিন্ রয় ঃ

'আচ্ছা, সত্যি কি টারজান তুমি দূর থেকে মানুষের গন্ধ টের পাও?'

টারজান বললো ঃ

'বাতাসের গতি স্বপক্ষে থাকলেই টের পাই। বাতাস যদি উল্টো দিক থেকে বয়, কিংবা যদি বাতাস বন্ধ হয়ে যায়—তাহলে আর কিছুই টের পাইনে।'

টারজানের কথা শেষ হতে না হতে বোঁ করে ছুটে এলো এক বর্শা। টারজান তাকিয়ে দেখলো—পেছনের ঝোপের আড়ালে কারা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চিৎকার করে রয়কে সাবধান করে দিয়েই টারজান সামনের দিকে দৌড়ুতে আরম্ভ করলো। রবিন্ রয়ও ছুটলো তার সঙ্গে

ঊর্ধ্বশ্বাসে। কিছুদূর যেতে না যেতেই টারজান একটা শব্দ শুনতে পেলো—'ধপাস্'। টারজান তাকিয়ে দেখলো—রবিন্ রয় মাটিতে পড়ে গেছে—তার পিঠে একটা বর্শা বিঁধে রয়েছে।

একটুখানি পিছনে হটে এসে টারজান এক হাতে রবিন্ রয়কে তুলে নিলো কাঁধে। তারপরই দৌড়ুতে শুরু করলো।

বোঁ করে তার মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেলো বর্শা—আর একটা গেলো পাশ দিয়ে।

চিৎকার করে উঠলো রবিন্ঃ

'সামলে চলো টারজান।'

চিতার মতো দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে টারজান। খানা-খন্দ লাফিয়ে সে পার হয়—সুবিধে পেলেই গাছের ঝুরি ধরে সে এক ধাক্কায় চলে যায় চল্লিশ হাত।

তার সঙ্গে তাল রেখে চলে—তেমন সাধ্য কারও নেই। সুবিধেমত একটা নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে টারজান কাঁধ থেকে নামালো রবিন্কে। তারপর একটানে তার পিঠ থেকে বর্শাটা খুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো টারজানঃ

'পিঠে কি লেগেছে?'

রবিন্ বললোঃ

'না—আমার সোনার তালগুলোই এবার আমায় রক্ষা করেছে। পিঠের ব্যাগটায় ছিল সোনা ভরতি—তাতেই আটকে গিয়েছিল বর্শাটা।'

একটু দম নিলো টারজান। রবিন্ জিজ্ঞেস করলোঃ

'এখন কি করবো?'



পিঠে একটা বর্শা বিঁধে রয়েছে [পৃষ্ঠা—৭৬

টারজান একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো ঃ

‘এক্ষুণি আবার আমাদের তৈরী হতে হবে। কারণ যারা আমাদের সন্ধান পেয়েছে, তারা এত সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে না। তুমি তোমার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ডানদিকে খেয়াল রাখো—আমি বাঁ দিকটা দেখছি।’

রবিন্ রয় তার বন্দুক-ধনুতে তীর লাগিয়ে নিশানা ঠিক করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওদিকে টারজানও তার ধনু বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমেই টারজান একটি শিকার করলো—চুপি চুপি এগিয়ে আসছিলো একটা বুনো, ওকে তৈরী হবার সুযোগ না দিয়েই টারজান অব্যর্থ সন্ধানে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো।

এদিকে গর্জে উঠলো রয়ের পিস্তল—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল আর্তকণ্ঠের কলরব। দল বেঁধে যে সব বুনো টারজানদের আক্রমণ করতে এসেছিল, তাদের বন্দুক-পিস্তলের সঙ্গে কোনদিন পরিচয় ঘটেনি। তাই অকস্মাৎ একসঙ্গে বজ্রের গর্জন আর আঘাত এবং বিদ্যুতের স্ফুরণ দেখে ভয় পেয়েছিল। হয়তো বা বুঝেছিলো—স্বয়ং বিধাতাই বুঝি তাদের বিরোধী।

তাই আর্তকণ্ঠের কলরব তুলে তারা পালিয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে টারজান আবার আর একটাকে বিঁধে ফেলেছে।

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মুহূর্তে বুনোদের দল এই অরণ্যই পরিত্যাগ করলো।

উত্তেজনায় রবিন্ রয়ের মুখ লাল হয়ে গেছে। সে আর তখন চলতে পারছে না। গাছের ডাল ভেঙে টারজান তাকে খানিক হাওয়া করে আবার চাঙ্গা করে তুললো।

একটু সুস্থ হয়ে তারা আবার চলতে সুরু করলো। কিন্তু চলতে গিয়ে পথ আর ফুরোয় না। অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করে রয়ঃ

'আজব দেশ কত দূরে টারজান!'

তাকে আশ্বাস দিয়ে টারজান বলেঃ

'এত অধীর কেন বন্ধু! যাবেই তো! বরং একটুখানি চারদিকে তাকিয়ে পথ চলো!'

চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করে রবিন্ঃ

'কেন, আরো বিপদ্ আছে নাকি?'

'বিপদের কি আর শেষ আছে? কিন্তু আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছি—একবার চোখ মেলে তাকিয়ে অরণ্যের সৌন্দর্য দেখে নাও। তুমি সভ্য জগতের মানুষ—সভ্য জগতেই ফিরে যাচ্ছো—হয়তো এই সুযোগ আর নাও পেতে পারো।'

টারজানের কথায় কিছুটা আশ্বাস পেলো রবিন্—তবু আরও একটু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে জিজ্ঞেস করলোঃ

'কিসের বিপদের কথা বলছিলে?'

'বলছিলাম—যদি আর কোন বুনোদের দল কিংবা হিংস্র পশু আক্রমণ না করে, তবে আর তেমন কোন বিপদ নেই।'

সভয়ে জিজ্ঞেস করে রবিন্ঃ

'কেন, বুনোরা আবারও আসবে নাকি? ঐ তো পালালো।'

হেসে উঠলো টারজানঃ

'না, ওরা বোধ হয় আর আসছে না।'

'আর যে হিংস্র পশুর কথা বলছিলে—এখানে কি তারও ভয় আছে নাকি?'

নিজের ঠোঁটে আঙুল চেপে টারজান রয়কে চুপ করিয়ে দিয়ে বললো :

'ঐ যে কান পেতে শোন।'

রবিন্ রয় খানিক কান পেতে থেকেই তাড়াতাড়ি পিস্তল হাতে তুলে নিলো। হেসে বললো টারজান :

'পিস্তলের প্রয়োজন হবে না বন্ধু! এই যে দেখছো খাড়ি—এটা পার হয়ে কেউ এপারে এসে তোমার উপর আক্রমণ চালাতে পারবে না।'

টারজানের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেলো—বিরাট-দেহ এক পশুরাজ হেলতে দুলতে চলেছে খাড়ির ওপর দিয়ে। দু'জন মানুষকে দেখতে পেয়ে তার আস্ফালন বেড়ে গেলো। কিন্তু নিরুপায় সে—লাফিয়ে তাদের উপর পড়বার ক্ষমতা তার নেই।

টারজান আর রবিন্ রয় হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মানুষের এই আস্পর্ধা দেখে পশুরাজ দাঁত খিঁচিয়ে তাদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করলো। ভয় পেলো না দেখে বুঝিবা লজ্জায় পশুরাজ নিজেই গেলো সরে।

টারজান বললো রবিন্ রয়কে :

'বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই আজব দেশে কত যে আজব জীবজন্তু আছে, তা' না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতে পারবে না।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রয়। টারজান বলতে লাগলো :

'তোমরা তো জ্ঞানী সভ্য মানুষ। তোমরা তো জানো যে

প্রাচীনকালে পৃথিবীতে বিরাট-আকার বহু জীবজন্তু বর্তমান ছিল—আজ তারা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে!'

ঘাড় নেড়ে রয় টারজানের উক্তি সমর্থন করলো। টারজান বললো:

'কিন্তু ঐ সব বৃহৎকায় জীবজন্তুর অনেকগুলিই এখনও বর্তমান রয়েছে এই আজব দেশে। আমরা এখন এই আজব দেশেই এসে পৌঁছেছি।'

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো রয়:

'রাজধানী কত দূরে?'

'রাজধানী এখনও বেশ কিছুটা দূরে আছে। ঐ দেখ, ঐ দেখ রয়—সামনে ওই উঁচু ঘাস-বনটার দিকে তাকিয়ে দেখ।'

তাকিয়ে দেখলো রবিন্ রয়—সরীসৃপ-জাতীয় বিরাট্ এক জীব—মাথা বাড়িয়ে তালগাছের ডগার পাতা খাচ্ছে।

এইভাবে পথ চলছে তারা দু'জনে। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। একটা ভালো দেখে গাছ খুঁজে নিয়ে তারই উপর রাত কাটালো টারজান আর রবিন্ রয়।

পরদিন সূর্য উঠবার আগেই আবার তারা বেরিয়ে পড়েছে। সোজা পশ্চিম দিক ধরে চলছে। অকস্মাৎ আলোর আভা তাদের চোখ ঝলসে দিলো।

অবাক্ হয়ে ভাবলো রবিন্—

'এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! এখানে কি পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হয় নাকি! আজব দেশের কি সবই আজব কাণ্ড?'

টারজান তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বললো:



তালগাছের ডগার পাতা খাচ্ছে [পৃষ্ঠা—৮১

'সূর্য নয় এটা ইঞ্জিনীয়ার—ঐটে হলো আজব দেশের রাজপ্রাসাদ।'

বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেল রবিন্‌ রয়।

আজব দেশের সর্বোচ্চ প্রাসাদের উপর যে সূর্যকিরণ পড়েছিলো, তারই প্রতিবিম্ব ঠিকরে পড়েছিলো ওদের চোখে-মুখে।

আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবার পর ক্রমে রাজধানীর রূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। দূর থেকে দেখে মনে হয়—সমৃদ্ধ নগরী। বিরাট্‌ বিরাট্‌ প্রাসাদ, অট্টালিকা, বাগান, বাজার সব দেখা যেতে লাগলো।

তাই অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই রবিন্‌ জিজ্ঞেস করলো ঃ

'বেশ তো আধুনিক সুসভ্য শহর বলেই মনে হচ্ছে—এখানে এরোপ্লেন পাওয়া যাবে না কেন বলতো!'

রহস্য ভাঙ্গলো না টারজান। মুচকি হেসে বললো ঃ

'একটু সবুরই কর না বন্ধু! গিয়েই বুঝতে পারবে সব।'

এগিয়ে যেতে লাগলো তারা।

* * * *

প্রাসাদ-প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়েছিল প্রহরী। দূর থেকে দু'জন অপরিচিত লোককে নগরের দিকে আসতে দেখে আগেই শোরগোল তুললো। নগরের ভিতর সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। সবাই নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে ঐ প্রহরীর দিকে—পরের সংবাদ জানবার জন্যে।

ওরা আরও খানিকটা এগিয়ে এলো। এবার প্রহরী জানালো

—দু'জনেই অস্ত্রধারী, শ্বেতাঙ্গ, কিন্তু অসভ্যের মতো পোশাক পরিধানে। এবং তাদের মধ্যে একজনকে যেন—

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সহসা চিৎকার করে উঠলো প্রহরী :

'টারজান ! টারজান !'

মুহূর্তের মধ্যে সেই সংবাদ গিয়ে পৌঁছালো রাজপ্রাসাদে—রাজার কানে।

রাজা বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন :

'রাজরথ বার করো। আর রানীকেও শীগ্‌গির সংবাদ দাও।'

আধঘন্টা মাত্র সময়—তারই মধ্যে রাজার রথ তৈরী হয়ে বেরিয়ে এলো। তার উপর যথোপযুক্ত মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে বসে আছেন রাজা আর রানী।

টারজান আর রবিন রয় তখনো নগরে প্রবেশ করেনি—এখনও বেশ খানিকটা দূরে। তারা দেখলো—সহসা নগরদ্বার খুলে গেলো। আর সারিবদ্ধভাবে বেরিয়ে আসছে একদল সিংহ !

রবিন্ রয়ের মুখ কালো হয়ে গেলো। সে টারজানকে চিৎকার করে বললো :

'ঐ দেখ টারজান ! ওরা একদল সিংহকে ছেড়ে দিয়েছে—এরা সব আমাদের ছিঁড়ে খাবে।'

টারজান ভালোমন্দ কিছুই বললো না। সে কেবল রয়ের কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে যেতে লাগলো।

টারজানের এই তূষ্ণীম্ভাব রয়ের ভালো লাগলো না। সে আবার টারজানের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো :

'টারজান! টারজান! ঐ দেখ!'

ওদিকে ততক্ষণে সিংহবাহিনী অনেকটা কাছে চলে এসেছে। এবার তারা স্পষ্ট দেখতে পেলো—সিংহবাহিনীর পেছনেই একটা সোনার রথ—আর সেই রথে বসে আছেন তথাকার রাজা আর রানী।

টারজানকে দেখতে পেয়েই রাজা চিৎকার করে বলে উঠলেন:

'স্বাগতম্ টারজান, স্বাগতম্! বহুদিন পর আবার তোমাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে জানাচ্ছি আমাদের সাদর অভিনন্দন! এসো! আমার প্রাসাদ-দ্বার তোমার জন্যে খুলে দিয়েছি।'

রাজার রথ চলে এলো টারজানের কাছে। রাজা রথ থামিয়ে বললেন:

'কোথায় রে! টারজানের রথ কোথায়?'

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এলো আর একটা সিংহ-বাহিত রথ।

রথের চালক সসম্মানে সিংহের লাগাম তুলে দিলো টারজানের হাতে। টারজান রয়কে সঙ্গে নিয়ে চড়ে বসলো সেই রথে। রাজার রথ আর টারজানের রথ চললো পাশাপাশি।

টারজান রবিন্ রয়কে পরিচিত করিয়ে দিলো রাজার সঙ্গে এই বলে যে:

'পাহাড়-ঘেরা এক অঞ্চল থেকে দীর্ঘকাল নির্জনবাস করে এসেছেন আমাদের এই বন্ধুটি—রবিন্ রয় নাম। এই পাহাড়ে তিনি অল্পস্বল্প সোনা কুড়িয়ে পেয়েছেন—আর তাই নিয়ে এসেছেন ইনি এখানে।'

টারজানের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন রাজা। তিনি বললেন ঃ

'সোনা আবার কুড়িয়ে পেতে হয়? টারজান, তুমি তোমার বন্ধুকে বলো যে তিনি যত সোনা চান, আমি তাই দেবো তাঁকে।'

টারজান রয়কে রাজার কথাটা বুঝিয়ে বললো। টারজানের কথা শুনে রবিন্ রয়ের তাক লেগে গেলো।

তাদের রথ এতক্ষণ রাজপুরীতে প্রবেশ করলো। এতক্ষণে রবিন্ রয়ের খেয়াল হলো—রাজার প্রাসাদটা আগাগোড়াই সোনায় তৈরী। আর তা' ছাড়া চারদিকেই সোনার ছড়াছড়ি।

রবিন্ রয় এতক্ষণে বুঝতে পারলো সোনার প্রাসাদের উপর সূর্যের কিরণ পড়েছিল বলেই তাদের চোখে এত আলো লেগেছিলো।

টারজান আর রবিন্ রয় আজব দেশের রাজপুরীতে অতিথি হয়ে রইলো। রবিন্ রয় ভাবলো—বাইরের জগতে গিয়ে যখন সে সব বলবে, তখন কেউ বিশ্বাস করবে না যে সত্যি এমন কোন দেশ আছে—যেখানে রাজপ্রাসাদ হয় সোনার আর সিংহেরা টানে রথ।

তাদের থাকবার জন্যে যে খাট দেওয়া হয়েছে, তাদের খাবার জন্যে যে সব পাত্র দেওয়া হয়—সব কিছুই সোনার তৈরী। আর শুধু তাই নয়—এতদিন ধরে তারা যে সব পোশাক পরে আসছিল—তাও সব তাদের ছাড়তে হলো। কত মণিমাণিক্যখচিত রাজপোশাক উঠলো তাদের দেহে।

একদিন টারজান বললো রবিন্‌কে :

'রাজা বলছিলেন—তুমি যদি এই আজব দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাও, তবে যত সোনা খুশী তুমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।'

ঘাড় নেড়ে বললো রবিন্ রয় :

'পাগল হয়েছো বন্ধু! কেউ যদি একখানা স্বদেশের টিকিট কেটে চার ইঞ্জিনযুক্ত এরোপ্লেনও আমাকে এনে দেয়—তবু আমি এই আজব দেশ ছাড়বো না।'

শুরু হলো তাদের আজব দেশের আজব জীবন।

আট

জলা-জঙ্গল পার হয়ে

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। আজব দেশের অপরিমিত ঐশ্বর্য আর রাজকীয় আতিথেয়তার স্বাদ পেয়ে রবিন্ রয় স্থির করেছিল যে, সে আর সভ্যজগতে ফিরে যাবে না। জীবনের বাকী দিন ক'টা এখানেই সে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ—তাই যখন টারজান বাড়ি ফিরে যেতে চাইল, তখন রবিন্ রয়ের মত গেল ঘুরে।

এতদিনে সে হাঁপিয়ে উঠেছে—আর এখানে থাকতে পারছে না। তাই টারজানের সঙ্গে যাবার জন্যে সেও বায়না ধরেছে। টারজান অনেক বুঝাল—কিন্তু রবিন্ রয় কিছুতেই আর থাকতে রাজী হচ্ছে না।

অবশেষে তারা দু'জনেই চললো সেই আজবদেশের মায়া কাটিয়ে। দূরে পড়ে রইল আজবদেশ—তারা চললো সেই বুনোদের গাঁয়ে—যেখানে টারজানের বাড়িতে আছে নোরা, আছে টমি।

টারজান চলেছে—দু'পাশে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে আজব-দেশের অধিবাসীরা। ক্রমে আজবদেশের সীমানা তারা পার হয়ে এল।

এইবার সামনে পড়লো বিরাট্ জলা-জঙ্গলে বোঝাই অরণ্য-ভূমি। অতি সাংঘাতিক সেই অরণ্য! কুমীর আর বাঘ চলে সেখানে পাশাপাশি।

টারজান তখনও তাকে উপদেশ দিয়ে বললো:

'বন্ধু! এখনও সময় আছে। আমার সঙ্গে চলতে গিয়ে তুমি নিজের প্রাণটা হাতে করে নিয়ে চলেছ। ফিরে যেতে চাও তো দিয়ে আসি তোমাকে।'

হেসে বললো রবিন্:

'কেন মিছে ভয় দেখাচ্ছো ভাই! তিন বছর আগে যেদিন বিমান-দুর্ঘটনায় জনবিহীন অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছি—জীবন তো সেদিন থেকেই হাতে নিয়ে ঘুরছি। এখন আর ভেবে তো লাভ নেই।'

বলতে বলতেই 'ওরে বাপরে' বলে চিৎকার করে রবিন্ দু'পা পিছনে সরে গেলো।

বিরাট্ একটা সাপ ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল—বোধ হয় রবিনের চিৎকার শুনেই হকচকিয়ে গেলো; তারপর আবার যেদিক থেকে এসেছিলো, সেই দিকেই চলে গেলো।

রবিন্‌কে তার প্রতিজ্ঞায় অটল দেখে টারজান বললো:

'বেশ, তবে এসো।'

রবিন্ চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো।

চলতে চলতে হঠাৎ তারা এক জলাভূমির সামনে এসে পড়লো। বিরাট্ সে জলাভূমি—ঘুরে যাবারও পথ নেই।

জঙ্গলের রাজা টারজান, যার ভয়ে বনের সিংহ-ব্যাঘ্রও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়, সেই টারজানকেও এবার রীতিমত ভাবিয়ে তুলল, কিন্তু এ ভাবনা বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। অকস্মাৎ টারজানের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। রবিন্ ক্ষীণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করেঃ 'এখন উপায় ?...'

মুখে কোন কথা না বলে টারজান অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিল জলাভূমির উপর দিয়ে কি যেন ভেসে আসছে।

রবিন্ চিৎকার করে উঠলঃ 'ভেলা! ভেলা!'

'চুপ!'—এক ধমক দিয়ে টারজান থামিয়ে দেয় রবিন্‌কে।

তারপর ভেলাটা কাছে আসতেই দু'জনে উঠে বসল তার উপর।

কিন্তু যত বিপদ মানুষ দেখতে পায়, তার ক'টারই বা সে প্রতি-বিধান করতে পারে!—আর অদৃষ্ট বলি তাকেই, যাকে আগে থাকতে দেখা যায় না—এবং মানুষকে চালায়ই তো অদৃষ্ট!

তাই টারজান আর রবিন্ অতি সতর্কতার সঙ্গে সব বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে গেলেও ধীরে ধীরে অদৃষ্ট যে তাদের জন্যে এক বিরাট্ ফাঁদ পেতে বসেছিলো, তা' কি আর তারা জানতো!

নিশ্চিন্ত মনেই তারা দু'জনে চলছিলো। অকস্মাৎ রবিন্ রয়ের চিৎকারে টারজানের চমক্ ভাঙ্গলো। সঙ্গে সঙ্গেই ভেলাটা যেন হঠাৎ বড় হাল্কা হয়ে গেলো। চট্ ক'রে টারজানের মনে হলো,— 'রবিন্‌কে কুমিরে নিয়ে যায়নি তো!'

জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো সে—নাঃ কোথাও তো তার কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

এমন সময় উপর দিক থেকে শোনা গেলো রবিনের কণ্ঠস্বর। রবিন্ চেঁচিয়ে বললো ঃ

'টাবজান, এই যে আমি—উপরে!'

অবাক্ হয়ে টারজান তাকিয়ে দেখলো—শক্ত লতার ফাঁস দিয়ে রবিন্‌কে আটকে ধরে টেনে উপরে তুলছে একটা বিরাট্ গরিলা।

অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে গরিলাটা ফাঁস ছুড়েছিলো। জলার ধার ঘেঁসে চলছিলো তারা—কাছেই ছিল একটা ঝাঁকড়া গাছ। সেই গাছে ছিল ঐ গরিলাটি।

টারজান আর রবিন্ শুধু জলের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলো—উপর দিক্ থেকে যে এ রকম কোন অপ্রত্যাশিত বিপদ্ আসতে পারে—তা' তাদের ধারণায়ই আসেনি।

বিরাট-দেহ সেই গরিলাটা ইতিমধ্যে রবিন্‌কে টেনে গাছের উপর তুলে নিয়েছে; আবার টারজানের দিকে তাকিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে শাসাচ্ছে।

গরিলার ভাষায় চিৎকার ক'রে উঠলো টারজান ঃ

'সাবধান গরিলা! আমিও গরিলা-মায়ের দুধ খেয়েছি—ছেড়ে দাও ওকে!'

টারজানের কথা শুনে বুঝি সেই গরিলাটা বিদ্রূপের হাসি হাসলো। তার ঐ হাসি দেখে টারজানের পিত্তি জ্বলে গেলো। চট্ ক'রে একটা লতা ধরে টারজান গাছে উঠতে লাগলো।

গরিলা লতার ফাঁসটাকে গাছের ডালে জড়িয়ে এক হাতে সেটা ধরে রাখলো, আর একটা হাত রাখলো মুক্ত—যদি প্রয়োজন হয়!

টারজান ইতিমধ্যে গাছে উঠে প'ড়েছে—সে আবার গরিলাভাষায় গরিলাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললো ঃ



'টারজান, এই যে আমি উপরে !' [পৃষ্ঠা—৯১

'এখনও বলছি—ঐ মানুষটাকে ছেড়ে দে—নইলে ভালো হবে না।'

এবারও সে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে নিজের মাতৃভাষায় বললো ঃ

'বাহাদুরি ক'রে এগিয়ে এলে তোমাকে খুন ক'রে ফেলবো।'

গরিলার এই ঔদ্ধত্য আর টারজানের সহ্য হ'ল না! গরিলাকে তৈরী হবার সুযোগ না দিয়েই টারজান তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

গরিলা এক হাতে দড়ি ধরে রেখেছিলো—টারজানের অতর্কিত আক্রমণকে তাই সে প্রতিরোধ করতে পারলো না। কোনরকমে সে এক হাতেই নিজের নাকমুখ বাঁচাতে লাগলো—টারজানকে একটাও পাল্টা আঘাত করতে পারলো না।

টারজান আকস্মিক একটা সুযোগ পেয়ে গরিলার চোয়ালে লাগালো বিরাশি সিক্কা ওজনের এক ঘুসি।

গরিলা আর টাল সামলাতে পারলো না—জগৎ-সংসার তার সামনে অন্ধকার হ'য়ে গেলো। সে ছিটকে পড়ে গেলো জলে—আর সঙ্গে সঙ্গে রবিন্ও পড়ে গেলো!

'কুমির, কুমির!'

রবিনের চিৎকারে টারজানের খেয়াল হলো। সে তাকিয়ে দেখলো—একটা কুমির গরিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর রবিন্ রয়ও গিয়ে পড়লো তাদেরই কাছে।

কুমিরটা যদি গরিলার দিকে না গিয়ে রবিনের দিকে ছুটে

আসে—তাহলেই বিপদ্। এর উপর রবিনের দেহে জড়িয়ে আছে আবার দড়ির ফাঁস।

আর চিন্তা করবারও সময় নেই। গাছের ডাল থেকে টারজানও ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

জল সেখানে খুব গভীর নয়—তবুও যে গতিতে রবিন্ ছিটকে পড়েছিল, তার ফলে সে একেবারে জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছিলো।

টারজানও রবিনের খোঁজে একদম জলের নীচে গিয়ে হাজির। রবিন সেখানে প্রাণপণে চেষ্টা করছে বাঁধনমুক্ত হবার জন্যে। টারজানও তাকে সাহায্য করতে লাগলো।

একটানে সে ফাঁসটা আল্গা ক'রে দিয়ে রবিন্‌কে দিলো এক ধাক্কা। ঠিক সেই মুহূর্তে কুমিরটা এসে হানা দিলো তাদের সন্ধানে।

টারজান তো ঠেলা দিয়ে রবিন্‌কে তুলে দিলো জলের উপর—নিজে কিন্তু উঠলো না। কারণ জলের নীচে থেকে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করাটাও ছিলো তার পক্ষে একটা অত্যন্ত আমোদজনক খেলা!

কুমির এসেই আক্রমণ করলো টারজানকে—টারজান চট্ ক'রে একপাশে সরে গিয়ে দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিলো কুমিরের মুখে। তারপর সজোরে এক টান—

কুমিরের মুখ বন্ধ হ'য়ে গেলো। ভুস ক'রে জলের নীচ থেকে উঠে এলো টারজান।

'সাবধান রবিন্! চট ক'রে ভেলায় উঠে যাও।'

টারজান বললো বটে, কিন্তু তার মনে হলো—ভেলায় চড়বার আগেই কুমিরটা রবিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

টারজানের পিঠে তখনও ঝোলানো ছিলো— তীর-ধনুক আর বর্শা।



দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিলো [পৃষ্ঠা—৯৪

শোঁ ক'রে ছুটে গেলো টারজানের বর্শা—তার লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না। কুমিরের রক্তে রাঙা হ'য়ে গেলো সেখানকার জল।

এই অবসরে রবিন্ লাফিয়ে উঠে পড়লো ভেলার উপর। টারজান তার নিজের বর্শাখানা উদ্ধার ক'রে যখন ভেলায় চড়তে যাবে, তখন দেখলো, আর একটা কুমির চুপি চুপি গরিলাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক চিৎকারে গরিলাটাকে সচেতন ক'রে দিয়ে টারজান নিজেও এক লাফে চড়ে বসলো ভেলার উপর।

তারপর দু'জনে মিলে ভেলা চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। রবিন্ রয়ের দৃষ্টি এবার আর নীচে জলের দিকে নয়—কাছে পিঠে গাছ থাকলে আগেই রবিন্ তাকায় গাছের দিকে। কে জানে, আবার কেউ দড়ির ফাঁস নিয়ে গাছের ডালে অপেক্ষা করছে কিনা!

বিপদসংকুল জলযাত্রা তাদের শেষ হলো। টারজান আর রবিন দু'জনেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ডাঙ্গার জীব জলে তেমন জোর পায় না।

ডাঙ্গায় উঠেই টারজান জানালো রবিন্‌কে ঃ

'এইবার শুরু হলো মরুভূমি। জলও নেই, জঙ্গলও নেই—কিন্তু তাই বলে যে আমাদের যাত্রা নিরুপদ্রব হবে—তা মনে করো না কিন্তু। আগের মতই সতর্ক হ'য়ে চলতে হবে—খেয়াল রেখো।'

রবিন্ রয় তার অস্ত্রগুলি একবার নেড়েচেড়ে দেখলো শুধু।

শুরু হলো আবার তাদের নতুন যাত্রা।

নয়

মরুভূমির পথে

সম্মুখে দুস্তর মরু।

গোধূলির হলদে রোদের নীচে শুকনো বালি জ্বলছে যেন। দিগন্ত-রেখা পর্যন্ত বিছানো রয়েছে যেন একখানা সোনার চাদর।

একগাছা ঘাস কোথাও চোখে পড়ে না। ছোটবড় জন্তু-জানোয়ার কারুরই সাড়া পাওয়া যায় না কোনদিক থেকে।

টারজান বলল : 'রাতটা যদি ঘুমোতে চাও এখানেই শুয়ে পড়। আর তা যদি না চাও, চল—যতক্ষণ পারি হাঁটি। কাল দিনের বেলায় মরুভূমি পাড়ি দেওয়া শক্ত হবে। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এখন যতটা এগিয়ে থাকা যাবে, ততটাই লাভ।'

রবিনের হাঁটবার শক্তি নেই আর। সারাদিন হেঁটে এসে অবেলায় পেট পূরে হরিণমাংস খাওয়া হয়েছে ; এখন দরকার একটা লম্বা ঘুম। তার গড়িমসি ভাব দেখে টারজান বলল : 'তাহ'লে থাক, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে, এখন ঘুমোও।'

বলতে বলতেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল টারজান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল একেবারে।

দু'জনের ভিতর রবিন্‌ই শ্রান্ত ছিল বেশী ; তার কিন্তু শোয়া-মাত্রই ঘুম এল না। প্রয়োজনমত দু'চারদিন ঘুমকে বর্জন করে চলা, আবার সুযোগ পেলে যখন তখন শুয়ে পড়ে দু'চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে

নেওয়া—এ একটা মস্ত ক্ষমতা। বিনা সাধনায় সে-ক্ষমতা কারও আসে না। টারজানের মত অরণ্যজীবদের সে-সাধনা থাকে, রবিনের মত সভ্যতার আওতায় লালিত যারা, তাদের থাকে না।

তাই শুয়েই টারজান ঘুমিয়ে পড়ল। আর তার অদূরে শুয়ে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে থাকল অভাগা রবিন্।

পিছনে জলাজঙ্গল তৃণভূমি; সমুখে দগ্ধ শুষ্ক মহামরু। কেমন যেন ভয় করছে রবিনের। এই কয়েকদিনে, বিভিন্ন পরিবেশে ছোট-বড় নানা বিপদ সে কাটিয়ে এসেছে; কিন্তু তাদের চাইতে শতগুণে ভয়াবহ সংকট বুঝি তার জন্যে ওৎ পেতে আছে ঐ মরুভূমির হালকা আঁধারের অন্তরালে। জলহীন জীবনহীন ঐ অজানা কান্তার—ওর ফাঁকে ফাঁকে ফাঁদ পেতে বসে আছে নিষ্ঠুর নিয়তি; ওর আকাশে বাতাসে কিলবিলিয়ে ফিরছে মৃত্যুদূতের অদৃশ্য অঙ্গুলি; সুযোগ পেলেই দুঃসাহসী পথচরের গলা টিপে দমটুকু নিঃশেষ করে দেবে।

কোথায় বহু দূরে শোনা গেল গুর গুর গর্জন।

মেঘ নয়, সিংহ!

রবিন্ তড়াক্ করে উঠে বসল।

কিন্তু উঠে বসে তো করবার কিছু নেই। এখানে পালাবার মত জায়গা নেই। আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। সিংহ যদি আসেই, তার কবল থেকে নিস্তার পাওয়ার এতটুকু আশাও নেই।

জঙ্গলে গাছ থাকে, পাহাড়ে গুহা থাকে, নদীর বুকে থাকে অথৈ জল। আশ্রয় নিতে পারা যায় সে-সব জায়গায়। কিন্তু এখানে সমুখে ধুধু মরু, পিছনে ধুধু প্রান্তর। সে-প্রান্তরে ঝোপঝাড়

হু'একটা আছে বটে, কিন্তু সিংহ দূরে থাক, ক্ষ্যাপা কুকুরের আক্রমণেও তার ভিতর নিরাপত্তার সম্ভাবনা নেই।

টারজান অঘোরে ঘুমোচ্ছে। রবিনের রাগ হয়। ঐ যে মেঘের ডাকের মত সিংহের ডাক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, এতেও কি এই লোকটার ঘুম ভাঙে না?

বড় দুঃখে হেসে ফেলল রবিন্। ঘুমোতে ঘুমোতে যদি মরতে পারা যায়, সে তো ভালই! টারজান ঘুমোক! নিকটে! আরও নিকটে! যত নিকটে আসছে, তত উঁচু পর্দায় উঠছে সিংহের গর্জন। রবিন্ স্পষ্ট অনুভব করল তার পিঠের তলায় মাটি থরথর ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠছে সে-গর্জনে।

আর দুই চার মিনিট। তার পরই সিংহ এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে রবিন্ আর টারজানের উপরে।

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড! টারজান এখনও ঘুমোচ্ছে। মাটি কাঁপানো আকাশ ফাটানো সেই মুহুর্মুহুঃ গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে স্পষ্ট শোনা যায় টারজানের নাসিকাধ্বনি।

এমন অবাক্ কাণ্ড রবিন্ কখনো দেখেনি।

হঠাৎ সিংহের ডাক থেমে গেল।

আর সেই সঙ্গে থেমে গেল টারজানের নাক-ডাকার শব্দ।

আরও অবাক্! টারজান উঠে বসল, হামা দিয়ে এগিয়ে চলল ডাইনের দিকে।

আসল কথাটি এই—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কানকে সজাগ রেখেছিল টারজান। অরণ্যজীবমাত্রকেই তা রাখতে হয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে প্রত্যেকটি গর্জন শুনেছে সিংহের। কিন্তু অবচেতন মনে এই

বার্তাটুকু প্রবেশ করেছে যে, সিংহ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে। অবচেতন মন ভয় পায়নি সে-বার্তা পেয়ে। কারণ সে-মন জানে যে, সিংহ গর্জন করে ঠিক ততক্ষণই—যতক্ষণ সে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে, খুঁজে পায়নি শিকারকে।

আর যেই খুঁজে পাওয়া, অমনি তার ডাকাডাকি বন্ধ হয়ে যাওয়া। গর্জন ক্ষান্ত হলেই বুঝতে হবে, সিংহ ঝাঁপ দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে এইবার।

সিংহ তৈরি হচ্ছে যখন—টারজানকেও তৈরি হতে হল।

ডাইনের দিকে হামা দিয়ে চলেছে টারজান। অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন্। এর মানে কী? টারজান হামা দিচ্ছে কেন? পালাবার হলে হামা দিত না। ছুটে পালাত।

পালাবার চেষ্টা এটা নয়। তবে?

হঠাৎ তার চোখে পড়ল।

আঁধার খুব নিবিড় নয়। আর অনেকক্ষণ সেই আঁধারের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে তারই ভিতর নজর চলছে রবিনের। যেখানে টারজান হামা দিয়ে ব'সে আছে, তার সামান্য কিছু দূরে মাটিতে হাঁটুভেঙে বসে আছে সিংহটা।

তারপর এক সেকেণ্ড।

একটা বজ্রনাদে বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গেল। একটা বিদ্যুৎ যেন উড়ে এল সেই সামান্য দূরত্বটুকু অতিক্রম করে।

রবিন্ চোখ বুজল। আপনা থেকেই বুজে এল চোখ—কতক ভয়ে, কতক বিতৃষ্ণায়।

কিন্তু আবারও গর্জন করে কেন? শিকার ধরবার পর আর

তো সিংহের চেঁচিয়ে মরবার কথা নয়! আবার চোখ মেলে তাকাল রবিন্।

এবার যে ভয়াবহ দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

টারজান যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে কয়েক হাত দূরে রয়েছে এখন। বসে নেই, দাঁড়িয়ে আছে।

আর সিংহটা? টারজান এত কাছে যে লাফ দেওয়ার আর সুযোগ নেই; সিংহ তাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে; দৈত্যের মত দীর্ঘদেহ টারজানেরও মাথা ছাড়িয়ে দু'হাত উপরে তার বিকট হাঁ যমদ্বারের মতই মুক্ত হয়ে আছে।

এবার লাফ দিল টারজান। সমুখে নয়, পাশে। ঘুরে গিয়ে ভোজালি বিঁধিয়ে দিল সিংহের পাঁজরে।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল পশুরাজ। সে বিকট গর্জনে রবিনের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটার ধুক্‌ধুকুনি থেমে গেল যেন।

আবার যখন সাহস সঞ্চয় করে ওদিকে সে চাইতে পারল—তখন সিংহের থাবার নীচে দাঁড়িয়ে তার গলায় ভোজালি বসাচ্ছে টারজান। আর সিংহ? সে কি চুপ করে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে? মোটেই না। নৌকোর দাঁড়ের মত তার দু'খানা পা ক্রমাগত বাতাস আঁচড়াচ্ছে। লক্ষ্য অবশ্য শত্রুর দেহ, কিন্তু সে-শত্রুকে নাগালের ভিতর পাওয়া দুঃসাধ্য। বিজলীর মত ক্ষিপ্র তার গতি; এদিক থেকে ওদিক, ডাইনে থেকে বাঁয়ে, সমুখ থেকে পিছনে সরে সরে যাচ্ছে বাত্যাতাড়িত বহ্নিশিখার মত; আর

প্রতি বার লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে পশুরাজের দেহে বইছে নতুন ক্ষতের রক্তধারা।



ভোজালি বিঁধিয়ে দিল টারজান সিংহের পাঁজরে। [পৃষ্ঠা—১০১

অবশেষে এর শেষ হল। সিংহের গর্জনের প্রচণ্ডতা ক্রমেই

কমে আসছিল ; এইবার আর্তনাদের মত একটা করুণ আওয়াজ করে সে ধীরে ধীরে বসে পড়ল পিছনের পায়ের উপর। তারপর কাত হয়ে লুটিয়ে গেল মাটিতে।

আর টারজান! রক্ত চুইয়ে পড়ছে তার অঙ্গ থেকে! তার নিজের রক্ত নয়, সিংহের রক্ত।

সেই ভূলুণ্ঠিত পশুরাজের দেহের উপর পা রেখে সে মাথা তুলে তাকাল নক্ষত্র-দীপ্ত নীল আকাশের পানে। তারপর তার কণ্ঠ থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল এক ভয়াবহ গর্জন ; সিংহ বা গরিলার উন্মত্ত জয়োল্লাসের মতই দানবীয় সে গর্জন।

প্রথমতঃ, সিংহে ও মানুষে সেই মৃত্যুপণ যুদ্ধ, তারপর এই অমানুষিক চিৎকার—রবিন্ বেচারা সহ্য করতে পারল না ; অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সে।

* * * *

সূর্য উঠবার আগেই বেরিয়ে পড়েছে দু'জনে। মরুভূমিটা পেরুতে তো হবেই।

পাশে পাশে চলছে আর চোরা চাউনিতে টারজানের দিকে এক একবার তাকিয়ে নিচ্ছে রবিন্। এই যে—যার সঙ্গে সে একসাথে পাড়ি দিচ্ছে এই অজানা মরু, এ কী জাতীয় জীব? যে প্রচণ্ড শক্তি এর প্রতি পেশীতে সুপ্ত হয়ে আছে, কোথা থেকে এল? এ মানুষ? না, অতিমানুষ? না, মনুষ্যবেশী কোন অজ্ঞাত জীব? শুধু হাতে মরুভূমির সিংহকে ক্ষতবিক্ষত নিহত করতে পারে—এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে বলে রবিনের ধারণা ছিল না, এখনো ধারণা হয় না।

ধারণা হয় না আরও একটা জিনিস। সিংহবধের পর সেই দানবীয় চিৎকার। কোন মানুষের গলা থেকে ঐ বীভৎস আওয়াজ —মেঘের ডাকের মত গম্ভীর, সিংহ-গর্জনের চাইতে জোরালো, ঝড়ের হা-হা ধ্বনির চাইতে ভয়াবহ—ও-যে বেরুতে পারে কোনদিন, তা স্বপ্নের অগোচর ছিল রবিনের। তাই তার মনে আরও সংশয়। টারজান কি মানুষ?

হঠাৎ চমক ভেঙে যায়।

দূরে দেখা যায় এক পাল শূকর।

মোটা সোটা নধর দেহ—দেখেই রবিনের মনে হয়, এদের একটাকে ঘায়েল করতে পারলে আজকের খানার যোগাড় হয়ে যায়। সে তার বন্দুকধনু উঁচু করে ছুটল সেই দিকে।

তৃণভূমি থেকে বেরিয়ে ওরা মরুভূমিতে চরতে যাচ্ছিল। রবিন্‌কে দেখে আবার ফিরল তৃণভূমির দিকে।

শূকরের পিছনে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল রবিন্। টারজান রইল দাঁড়িয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ যায়—রবিন্ ফেরে না। টারজান একটু উৎকণ্ঠায় পড়ল তার জন্য। বিজন কান্তারে অজানা বিপদ যে কোন মুহূর্তে এসে মানবকে গ্রাস করতে পারে।

টারজান এগিয়ে যাবে [illegible]া ভাবছে—এমন সময় চমকে উঠল। বন্দুকের শব্দ!

* * * *

তৃণভূমির অপরপ্রান্ত দিয়ে চলেছিল একদল আরব দস্যু। শূকরের পিছনে ছুটতে ছুটতে রবিন্ গিয়ে পড়ল তাদের ভিতর।

এ দস্যুরা দাস-ব্যবসায়ী। আফ্রিকার নানা জায়গা থেকে গ্রামবাসী নিগ্রো বা কাফ্রি বা হাবসীদের ধ'রে নিয়ে আরবে, ইরাণে, ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের নানা দেশে বিক্রি করে ওরা।



রবিন্ তার বন্দুক উঁচু ক'রে ছুটল শুকরের দিকে। [পৃষ্ঠা—১০৪

এই জনহীন মরুতে ধ'রে নেবার মত লোক পাবে এ আশা তারা করে নি। হঠাৎ একটা মানুষ দেখতে পেয়ে খুশী হয়ে উঠল দস্যুরা! মানুষটা আবার সাদা মানুষ। সোনায় সোহাগা। দাসের বাজারে সাদা দাসের দাম অনেক বেশী।

ধরা পড়বার আগে নিজের বন্দুক একবার মাত্র ছুঁড়তে পেরেছিল রবিন্। সে অবশ্য ফায়ার করেছিল শত্রু নাশের উদ্দেশ্য নিয়েই। কিন্তু শত্রুর কোন ক্ষতি যদিও সে করতে পারল না, গুলিটা বৃথা গেল না। টারজান শব্দ শুনেই ভাবল—রবিনের বিপদ ঘটেছে! বারুদের অপব্যয় সম্বন্ধে রবিন্ যে অতিমাত্র হুঁশিয়ার, তা টারজান জানে। শূকর মারবার জন্য বন্দুকের মাথায় ধনুক আছে তার। শিকারের উদ্দেশ্যে সে কখনও বন্দুক ব্যবহার করবে না।

দস্যুরা রবিন্‌কে পিছমোড়া করে বেঁধে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলল। তারপর তৃণ-ভূমির ভিতর দিয়েই দ্রুত ছুটল যে দিকটায়—সেটা রবিন্-টারজানের গতিপথের দিক নয়।

সারা দিন ঘোড়া ছুটল তাদের।

আর সারা দিন টারজান ছুটল ঘোড়ার পিছনে।

রাত্রির অন্ধকারে দস্যুদের ছাউনিতে আলো জ্বলছে মিটিমিটি, একটা ছেঁড়া তাঁবুর ভিতর হাত-পা-বাঁধা রবিন্।

দস্যুরা বাইরে গোল হয়ে বসেছে অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে। ঘোড়াগুলিও আছে তাদের নিকটেই। একটা গাছের ছায়ানিবিড় অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে ছাউনির চারিপাশ।

হঠাৎ—ঠিক রবিনের তাঁবুর পিছন থেকেই—গভীর আঁধারের বুক চিরে গর্জে উঠল পশুরাজ সিংহ।

লাফিয়ে উঠল দস্যুরা। ঘোড়াগুলো ছটফট করতে লাগল ভয়ে। আবার সেই সিংহ-গর্জন! আবার!

দস্যুরা সন্তর্পণে মশাল হাতে এগিয়ে চলল সেইদিকে।

শিয়রে সিংহ নিয়ে রাত্রি যাপন করা অসম্ভব। তার চেয়ে চেষ্টা করে ওকে যদি সাবাড় করে দেওয়া যায়। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোনো যাবে সারা রাত।

আর শোনা যায় না সিংহের ডাক। দস্যুরা পাতি পাতি করে খুঁজছে। সরে যাচ্ছে ছাউনি থেকে দূরে খোঁজার ঝোঁকে।

সিংহ তখন রবিনের তাঁবুতে ঢুকেছে। সিংহ অর্থাৎ টারজান। আসলে এ গর্জন কোন সিংহের নয়। টারজান নকল করতে পারে যে-কোন বন্যপশুর ডাক। সিংহের মত গর্জন করে সে-ই ভীতচকিত করে তুলেছিল দস্যুদের।

রবিন্ ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই ভোজালি দিয়ে তার হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিয়েছে টারজান। তারপর তাকে টেনে তুলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ড পেরিয়ে একেবারে ঘোড়ার পিঠে। দু'জনে দুটো তেজী আরবী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসল। তার আগে অন্য ঘোড়াগুলোর পায়ের দড়ি গলার দড়ি দিল কেটে।

টারজান ছুটে বেরিয়ে গেল ঘোড়ার পিঠে। রবিন্ তার সঙ্গে।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেয়ে দস্যুরা আবার ছুটে এল ছাউনির ভিতর, কিন্তু কোথায় বন্দী? আর কোথায়ই বা তাদের সেই আরবী ঘোড়া?

ছুটে চলেছে টারজান আর রবিন্। সারা রাত। মরুভূমি পেরিয়ে ছুটেছে তারা টারজানের গ্রামের উদ্দেশে।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। পুব আকাশে দেখা দিল আলোকের পূর্বাভাস। টারজান দেখে—সমুখে বিশাল একটি নদী।

নদী? টারজানের গ্রামে যেতে তো নদী পড়ে না!

পথ ভুল হয়েছে তা হলে। দিক্ চিহ্নহীন মরুতে প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে উলটো দিকে এসে পড়েছে তারা।

টারজান তাকায় রবিনের দিকে। রবিন্ তাকায় টারজানের দিকে।

টারজান হেসে ফেলল। 'দস্যুরা ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখে দেখে আমাদের পিছনে আসতেও পারে। একটু বিশ্রাম করে নাও; সাঁতরে পার হতে হবে এই অজানা নদী।'

দশ

স্রোতের টানে

রবিন্ বড় মনমরা হয়ে পড়েছে। তার পিঠের যে সোনার বস্তা ডাকাতেরা কেড়ে নিয়েছিল, তা আর উদ্ধার হয়নি। তার হাতের বন্দুক-ধনুটা পর্যন্ত আজ আর হাতে নেই; তাও রয়ে গিয়েছে আরবদের ছাউনিতে। প্রাণ নিয়ে পালাবার সময় এসব জিনিসের কথা মনেই পড়েনি রবিনের; কিন্তু এখন কথার ফাঁকে ফাঁকে তার আপশোষ আর মনস্তাপ বারে বারেই প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

একটা খরগোশ ছুটে পালাল সমুখ দিয়ে।

"এঃ হেঃ—দেখেছ টারজান? সামান্য খরগোশটা মেরে খাব, তারও উপায় নেই। অথচ কাল সারা দিন বদমাইশ দস্যুরা কিছু খেতে দেয়নি! এমন খিদে পেয়েছে!"

টারজান নদীর দিকে তাকিয়েছিল। একটা আজগুবি দৃশ্য চোখে পড়েছে তার। মাঝনদীতে আথাল-পাথাল ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে গোটা চার-পাঁচ কালো কালো জানোয়ার সোজা হেঁটে ওপারের দিকে এগিয়ে চলেছে!

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রবিন্‌ও [redacted]কে তাকাল। বলে উঠল—"কী ওগুলো? হাতি, না মোষ?"

টারজান একটু হেসে বলল—"এতদূর থেকে বলা শক্ত। তবে একথাও ঠিক যে ওগুলো হাতি কি মোষ, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি ভাবছি, এত কম জলে এত বড় ঢেউ উঠছে

কেমন করে। জল কত কম দেখছ না! জন্তু ক'টা হেঁটে পার হচ্ছে, সাঁতরে নয়।"

বলতে বলতেই টারজান উঠে দাঁড়াল।

"চল, আমরাও পেরিয়ে যাই ঐখান দিয়ে। এত ঢেউ ভেঙে সাঁতার দিয়ে পেরুতে হলে কষ্টই হত।"

"কিন্তু কিছু খাবার যোগাড় না হলে—" আপত্তি জানাল রবিন্।

"ঘাসের দড়ি তৈরি করে তারই ফাঁসে খরগোশ আমি ধরতে পারি রবিন্। কিন্তু তাতে অন্ততঃ আধঘণ্টা সময় লাগবে। সে-সময় ত' আমাদের হাতে নেই! এক্ষুণি হয়ত দস্যুরা এসে পড়বে। আগে চল নদীটাকে পিছনে ফেলি; তারপর উদরের বরাতে যা থাকে, তাই হবে।"

আরবী ঘোড়া দুটোকে ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছিল রবিনের। এমন তেজী! এত সুন্দর! ছোটে যখন, ঝড়ের পাখায় ভর করে আগুনের হল্‌কা ছোটে যেন।

"এদের ও-পারে নিয়ে যাওয়া যায় না?"—ভয়ে ভয়ে টারজানকে জিজ্ঞাসা করল সে। "সোনা লুট হয়ে যাওয়ার একটুখানি ক্ষতিপূরণও হয় তা হলে।"

টারজান হেসে বলল—"নিয়ে হয়ত যাওয়া যায়। মোষ পেরুচ্ছে, ঘোড়াই বা পারবে না [illegible] কিন্তু অজানা জায়গায় দুটো ঘোড়া সঙ্গে থাকলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধে বেশী।"

বলতে বলতে জলে নেমে পড়ল টারজান। অগত্যা নামতে হল রবিন্‌কেও। ঘোড়া দুটো নদীর কূলে ঘাস খাচ্ছিল। মুখ তুলে চিঁ হিঁ শব্দে ডেকে উঠল একবার—তার অর্থ বোধ হয়

এই যে 'আমাদের একা ফেলে চলে যাচ্ছ তোমরা ? এইটেই কি উচিত হল ?'

সে নীরব তিরস্কার কেমন যেন অসহ্য মনে হল টারজানের ; কিন্তু না ফিরে সে দ্রুত জলের ভিতর নেমে গেল।

বেশ বোঝা যায়—ডাইনে বাঁয়ে গভীর জল, মিশকালো তার রং। মাঝখানে হাত দুই চওড়া এক ফালি রাস্তা। তার উপরে জল যেন পাঁশুটে। পায়ের তলায় ফুটছে শক্ত পাথর ; এক গলা জলের নীচে বরাবর যেন জলপরীদের হাতে-গড়া জাঙ্গাল একখানি।

কিন্তু কী দুরন্ত ঢেউ ! এই জাঙ্গালের উপর তার আছাড়ি-বিছাড়ি যেন আরও প্রচণ্ড ! তারই ধাক্কা এক সময়ে রবিন্‌কে উলটে ফেলে দিল গভীর কালো জলের ভিতরে। সাঁতার অবশ্য জানে সে, কিন্তু অতবড় ঢেউয়ের ভিতর সাঁতার সে কখনো দেয়নি ; নাকে মুখে জল ঢুকে হাঁইফাঁই করতে লাগল রবিন্ ! শত চেষ্টাতেও অথৈ জল থেকে উঠে এসে সে আর জাঙ্গালের উপর দাঁড়াতে পারল না।

তাকে টেনে আনবার জন্য টারজানও গভীর জলে নামবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় কানে এল একটা সোঁ-সোঁ শব্দ। পিছন পানে তাকিয়ে টারজান দেখে—নদ[illegible]টা জুড়ে একটা দশ হাত উঁচু কালো দেয়াল তীরবেগে তার দিকেই ছুটে আসছে। এ জিনিস কী—তা সে বুঝতে পারল না হঠাৎ ; কারণ, নদীর জোয়ার-ভাটার সঙ্গে তার পরিচয় সামান্যই।

হুড়্ হুড়্ সোঁ সোঁ শব্দে পৃথিবীটা যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল

একেবারে। 'রবিন্' বলে ডাক দিল টারজান; কিন্তু সে ডাক তার নিজের কানেই ঢুকল না। ওদিকে নিকটে এসে পড়ছে সেই জলের দেয়াল। জাঙ্গালের উপর বুক-জল ছিল টারজানের, সে-জল হঠাৎ ফুলে উঠে তার কণ্ঠ স্পর্শ করল।

যেটা আসছে, সেটা যে জল তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে টারজান। সে ঝাঁপ দিল রবিন্‌কে লক্ষ্য করে। একটা দারুণ বিপদ অতি আসন্ন, এ সময়ে রবিন্‌কে আশ্রয় দেওয়া তার প্রথম কর্তব্য।

ঝাঁপ দিয়ে রবিন্‌কে যখন সে ধরল, তখনও জোয়ারের প্লাবন একটু দূরে আছে। টারজান প্রাণপণে সাঁতার দিতে লাগল কূল লক্ষ্য করে। রবিন্ প্রায় চৈতন্য হারিয়েছে; তাকে পিঠের উপর তুলে সাঁতার দিচ্ছে টারজান। মাথার উপর ভেঙে পড়ছে হাতির মত বড় বড় ঢেউ; সেই ঢেউয়ের ধাক্কা কাটিয়ে যখনই মাথাটা তুলছে একবার তখনই কানে ঢুকছে সোঁ সোঁ ঝপাং ঝপ্ শব্দ, প্রমত্ত জলকল্লোল এল বুঝি—তুচ্ছমানুষ দু'টিকে অতলে তলিয়ে দেবার জন্য।

যেন বাজি রেখে দৌড়োচ্ছে এরা। টারজান ছুটছে কূলের দিকে, জোয়ার ছুটছে টারজানের দিকে। ঢেউয়ের আঘাত যদি এত প্রচণ্ড না হ'ত, টারজান এতক্ষণ পৌঁছে যেত হয়ত। কিংবা রবিন্ যদি টারজানের কাঁধে চেপে[redacted]কত, তা হলেও এত মন্থর হ'ত না তার গতি।

টারজানের দুটো বাহু—হাতির সঙ্গে লড়েছে যারা, সিংহের চোয়াল চেপে ধরে গুঁড়ো করে ফেলেছে যারা,—সেই বাহু দুটোর তাড়নে ভয়ংকরী নদীর উত্তাল তরঙ্গ ক্রুদ্ধ গর্জন করে ব্যর্থ

আক্রোশে ; টারজান এগিয়ে যায় দুর্নিবার বেগে, এদিকে জোয়ারও এসে পড়ে তুমুল অট্টরোলে।

আর অল্প দূর ! অতি সামান্য কয়েক হাত জায়গা !

এইটুকু পেরুতে পারলেই ওরা নিরাপদ। ওই যে ডাঙ্গা !

রবিনের চৈতন্য ফিরে এসেছে এতক্ষণে।

টারজানের চোখ রয়েছে জলের উপর, জল ছাড়া কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার পিঠে শুয়ে রবিন্ অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছে —ডাইনের দিকে জোয়ার, মাথার উপরে আকাশ—

মাথার উপর শুধু আকাশ নয়, একখানা গাছের ডাল।

এক বিরাট মহীরুহ কবে পাড় ভেঙে নদীর ভিতর পড়েছিল। তার একখানা উঁচু ডাল আকাশ পানে আজও তার ন্যাড়া মাথাটি উঁচু করে আছে।

ডাইনে তিন হাতের ভিতরে এসে পড়েছে কালো জলের উঁচু প্রাচীর—তার পায়ের তলায় টগবগ করে ফুটছে পাতাল রাক্ষসীর দাঁতের মত সাদা একটা উঁচু-নীচু কুটিল জলরেখা। রবিন্ হাত বাড়িয়ে ডালখানা ধরে ফেলল।

টারজান তা টের পেল না। আর একটা বড় ঢেউ কাটাবার জন্য সে হাত বাড়িয়েছে, এমন সময়ে একটা চলমান পর্বত তার মাথার উপর ভেঙে পড়ল যেন। টারজান ভিন্ন মানবজাতীয় অন্য যে-কোন জীবের পক্ষে সে-আঘাত কাটিয়ে ওঠা কখনও সম্ভব ছিল না। এমন যে দৈত্যের মত বলশালী টারজান—সেও মিনিট দুই দিশাহারা হতচেতনের মত একান্ত অসহায়ভাবে নাকানি-চোবানি খেতে থাকল সেই ধাবমান শব্দায়মান জল-প্রাচীরের তলায়।

ছাগশিশুর মাথা কেটে ফেললেও তার চারখানা পা যেমন



রবিন্ হাত বাড়িয়ে ডালখানা ধরে ফেলল। [পৃষ্ঠা—১১৩]

কিছুক্ষণ ধরে সবলে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হতে থাকে, ঠিক সেই রকমই হয়েছিল টারজানের ব্যাপারে। জ্ঞান না থাকলেও হাত-পা তার ব্যাকুল হয়ে আঘাত করছিল উপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে কালো জলের পিছল গায়ে।

সেই ক্রমাগত হাত-পা-নাড়ার ফলে এক সময়ে সে ভুস্ করে জেগে উঠল জোয়ার জলের মাথার উপরে। নিজের অবস্থা বুঝবার মত বুদ্ধি তার ফিরে এল আরও কিছুক্ষণ পরে। তখন সে দেখল— জোয়ার তাকে তীরবেগে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অজানা নদীর উজানে। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায় দুই তীরেই। তাদের মাথা, তাদের গা, তাদের পাদদেশ সব আচ্ছন্ন করে রয়েছে বিরামহীন বনানী। আকাশে মাথা তুলেছে বিশাল সব বনস্পতি, আর মাটিতে জালের মত পরস্পরের অঙ্গে গিঁঠে গিঁঠে জড়িয়ে আছে কাঁটা গাছ আর বন্য লতা। এ সব বনে সূর্যের আলো ঢোকে কি না, সন্দেহ হল টারজানের।

শৈশবে গরিলা-মায়ের বুকে প্রথম যেদিন জ্ঞানোদয় হয়েছিল টারজানের, সেইদিন থেকেই মৃত্যু তার খেলার সাথী। সেই চিরদিনের সঙ্গীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে শিশু টারজান হয়েছে বালক, বালক টারজান পা দিয়েছে বলিষ্ঠ যৌবনে। তাই অনন্ত কালো জলের মধ্যে নিজেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃসঙ্গ বন্দীরূপে দেখতে পেয়েও ভয়কে তার মনে সে ঢুকতে দেয়নি। আশেপাশে উঁকি দেবার চেষ্টা কি একেবারেই করেনি ভয়? করেছে! কিন্তু প্রতিবারেই হেসে টারজান ভয়কে মোক্ষম জবাব দিয়েছে—"তোমার এখানে প্রবেশ নিষেধ। দেখছ না, চিরদিনের খেলার সাথী মৃত্যু

আমার পাশে রয়েছে? তার সাহসেই তোমায় আমি চিরদিন অগ্রাহ্য করব।"

ছুটে চলেছে টারজান জোয়ার জলের মাথায়! মৃত্যুর সঙ্গে গলাগলি হয়ে! কয়েক ঘণ্টা! নদী ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, হু'ধারের পাহাড়-প্রাচীরের ভিতর দিয়ে চলতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে জোয়ারের বেগ দুর্বল হয়ে এসেছে, ক্রমশঃ। অবশেষে এক সময় জোয়ার নিঃশেষ হয়ে গেল—একটা মোড় ঘুরে পাহাড়ের বেষ্টনীর বাইরে এসে পড়ল টারজান। দেখল, তার সমুখে এক আশ্চর্য দৃশ্য।

নদীর এপারে যতদূর দৃষ্টি চলে—সমতল প্রান্তর, তার মাঝখানে এক সোনার শহর।

নদীর ওপারে যতদূর দৃষ্টি চলে—নিবিড় বনভূমি। এ পারের সাথে ওপারকে যোগ করেছে এক সোনার সেতু!

সূর্য তখন টারজানের মাথার উপরে। চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে প্রচণ্ড রৌদ্রে। আর সেই রৌদ্রে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে গোটা শহরটা, গোটা সেতুটা।

টারজান চোখ ফিরিয়ে নিল। তাকাল ওপারের শ্যামল বনভূমির পানে। জুড়িয়ে গেল তার দৃষ্টি।

নদী এখন শান্ত ও সংকীর্ণ। নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে বনের দিকেই চলল টারজান। শহর আর সেতু যেখানে আছে—মানুষ সেখানে অবশ্য থাকবে। আর মানুষ যেখানে আছে—সেখানে সতর্ক হওয়া দরকারও আছে। সিংহ ও গরিলাকে টারজানের ভয় নেই। ভয় অবশ্য মানুষকেও নেই; কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে

এইটুকু চেতনা তার আছে যে বেপরোয়াভাবে ওদের মাঝে গিয়ে পড়া চলে না। আগে দূর থেকে দেখা উচিত ওদের হাব ভাব রীতি-চরিত্র; কারণ, মানুষ যখন বিপজ্জনক হতে চায়, তখন সে সিংহ বা গরিলা বা সাপের চাইতেও ঢের বেশী বিপজ্জনক হতে পারে।

কাজেই নদী পেরিয়ে বনের ভিতর ঢুকল টারজান।

ঢুকবার ঠিক আগে একবার পিছন ফিরে নদীর পানে তাকাল সে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল রবিন্‌কে স্মরণ করে। বেচারী! এই প্লাবনের কবল থেকে সে কি উদ্ধার পেয়েছে? নাঃ, আশা করতে পারে না টারজান।

নিবিড় বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল, বনের মানুষ টারজান।

* * * *

সোনার সহরে আজ মহা হৈ-চৈ।

সোনা-বনের রাজা আজ ধরা পড়েছে ফাঁদে।

সোনা-বনের রাজা—সে এক সোনার বরণ সিংহ। আকারে একটা বুনো মোষের মত প্রকাণ্ড; গায়ের জোরে একটা বুনো হাতীর সমকক্ষ। কাঁচা সোনার মত তার গায়ের রং, মাঝে মাঝে নদীর ধারে যখন জল খেতে নামে, শহরের প্রতি বাতায়ন থেকে লোকে দেখতে পায়—বৃহৎ এক আগুনের কুণ্ড যেন লেলিহান হয়ে জ্বলছে জলের উপর।

সোনা-শহরের লোকে তার নাম দিয়েছে 'দানো'।

এ-নাম রাগের বশেই দেওয়া। বনের রাজার উপর দারুণ রাগ শহরের লোকের। এ-রাগের কারণ আছে। এখানকার

লোকেরা সিংহ পোষে—ঠিক আজব শহরের অধিবাসীদের মত। প্রতি গৃহস্থের ছু-একটা সিংহ আছে। বড় লোকদের আছে ছু'শো একশো। সিংহ দিয়ে চাষ করায় তারা, সিংহীর ছুধ খায়।

সিংহ ধরে বন থেকে। কিন্তু দানোকে কেউ ধরতে পারেনি। রাজার নিজের পক্ষ থেকেই বার বার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সব চেষ্টাই হয়েছে ব্যর্থ! যেমন তার গায়ের জোর, তেমনি তার বুদ্ধি। জাল ছিঁড়ে সে পালায়; বল্লমধারী শিকারীদের বেষ্টনী অনায়াসে লাফিয়ে পার হয়ে যায়। কোনমতেই সে ধরা পড়ে না।

আজ কিন্তু পড়েছে। মাটিতে গভীর কূপ খনন করে উপরটা পাতা-লতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল শিকারীরা। এ রকম ফাঁদ আগেও বহুবার করা হয়েছে, দানো তার পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে। টের পেয়েছে ফাঁদের অস্তিত্ব।

দৈব বুঝি বিরূপ, তাই আজ কিন্তু টের পায়নি। হুড়মুড় করে পড়ে গিয়েছে গভীর গর্তে। পড়েই ভয়ে বেদনায় একটা হুংকার ছেড়েছিল, তার পরেই চুপ্ করে গিয়েছে। চুপ্ করে প্রতীক্ষা করছে সুযোগের। সে জানে যে, গর্তের ভিতর তাকে মেরে ফেলা শিকারীদের পক্ষে সোজা। কিন্তু গর্ত থেকে তুলে বেঁধে শহরে নিয়ে যাওয়া কঠিন। সেই কঠিন কাজটিরই চেষ্টা অবশ্য ওরা করবে। সেই চেষ্টার ফাঁকে কোনভাবে দানোর পক্ষে পালানোর সুযোগ করে নেওয়া সম্ভব হতেও পারে। তাই আশায় বুক বেঁধে সে প্রতীক্ষা করছে।

শিকারীরা গর্ত খুঁড়ে রেখে গিয়েছিল, অন্য সিংহ ধরবার আশায়। দু'টি মাত্র লোক এসেছিল—ফাঁদের তদারক করবার জন্য। কূপের ভিতর তাকিয়েই তারা চেঁচিয়ে উঠল। আনন্দে ফেটে পড়বার যোগাড় তারা। দানোকে তারা চেনে। অতবড়ো সিংহ আর বনের ভিতর নেই। অমন সোনার মতন রং আর কোন সিংহের নয়। এ নিশ্চয় দানো।

দু-জনের একজন রইল দানোকে পাহারা দেওয়ার জন্য, আর একজন শহরে ছুটলো সুখবর দেওয়ার জন্য।

হৈ চৈ পড়ে গেল শহরে। দানো ধরা পড়েছে এতকাল পরে। রাজা হুকুম দিলেন—ওকে জ্যান্ত বেঁধে আনতে হবে। পোষ মানাতে হবে। রাজার সিংহশালায় বেলসার-এর দোসর হবে সে। এখন পর্যন্ত যত সিংহ আছে রাজার, তার মধ্যে বেল্‌সারই সেরা! রাজার অতি প্রিয় সে। রাজা দানোকে দেখেননি, তাই তিনি চিরকাল বলে আসছেন—বেল্‌সারের সমকক্ষ সিংহ এ-জগতে নেই; দানোর চাইতেও সে তেজীয়ান। শহরের লোক কেউ তা স্বীকার করে না; কারণ, তারা অনেকেই দানোকে দেখেছে। এইবার রাজা পরখ করতে পারবেন—কে শ্রেষ্ঠ, বেল্‌সার না দানো। তাঁর অবশ্য স্থির বিশ্বাস—প্রতিযোগিতায় তাঁর বেল্‌সারই জিতবে।

আয়োজন হ'ল চূড়ান্ত। দানোকে বেঁধে আনতে একটা পুরো পল্‌টন সাজল। বেশ একটু সময় লাগল এই আয়োজনে।

* * * *

এই সবে আজই সকালে। টারজান বলেছিল—"রবিন ভাই, ঘাসের দড়ি দিয়ে বুনো খরগোশ আমি এখনি ধরতে পারি; কিন্তু

তার সময় কই ?”—সময় তখন ছিল না, সময় এতক্ষণ হয়নি। হ'ল এইবার, এই পড়ন্ত বেলায়—যখন রবিন হয়ত যমদ্বারের অতিথি হয়েছে।

পেটে আগুন জ্বলছে। ঘাসের দড়ি নয়, লতার দড়ি তৈরি করল টারজান। খরগোশ ধরবার জন্য নয়, হরিণ ধরবার জন্য। বেশ বড় হরিণকে ছুটন্ত অবস্থায় টেনে রাখবার মত মজবুত দড়ি একগাছা।

হরিণ ধরতে দেরি হ'ল না। ছয় ঘণ্টা আথাল-পাথাল জলের সঙ্গে যুদ্ধ করেও কোমরে গোঁজা ভোজালিখানা টারজান হারায়নি ; তাই দিয়ে বড় বড় কয়েক ফালি মাংস হরিণের গা থেকে কেটে নিয়ে লাফ দিয়ে টারজান গাছে উঠল। কারণ, বাতাসে ভেসে আসছে মানুষের স্বর।

গাছে বসে প্রথমে ভোজনপর্ব সমাধা করল টারজান। অনেকদিন কাঁচা মাংস চিবিয়ে খায়নি সে, তার দরকার হয়নি গ্রামের বাড়িতে। আজ গভীর বনে গাছের মাথায় বসে বহুদিন পরে সে রক্তমাখা কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেল। ভালই লাগল তার। অরণ্য-জীবনের ভুলে-যাওয়া আনন্দ তার শিরায় শিরায় ফেনিল হয়ে নৃত্য করতে লাগল বহুদিন পরে।

মানুষের কথা আবারও শোনা যায়।

গাছে-গাছে টারজান এগিয়ে চলে স্বর লক্ষ্য করে।

অবশেষে গাছের মাথা থেকে সে দেখতে পেল—ঠিক তার পায়ের তলার এক শিকারী দাঁড়িয়ে আছে বর্শা হাতে করে, আর শিকারীর সমুখে মাটিতে দেখা যাচ্ছে একটা কূপ ; যার ভিতরে আবছা আঁধারে চোখে পড়ে যেন বৃহৎ কোন এক বন্য জানোয়ার।

ফাঁদ পেতে, বিশেষতঃ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বনের বলবান পশুদের বন্দী করা, এটা টারজানের চিরদিন অপছন্দ। নিজে সে বীর; গায়ের জোরে পশুবধে তার আনন্দ আছে। পশুর উপর চাতুরী? ছোঃ! চাতুরী প্রয়োগ করা চলে মানুষের উপর; কারণ, মানুষ মাত্রেই চতুর। পশুরা নির্বোধ, তাদের উপর চাতুরী খেলতে যাওয়া রীতিমত নীচতা, টারজানের বিবেচনায়।

এই শিকারীটাকে তার চাতুরীর জন্য সাজা দেওয়া উচিত।

হাতের দড়ি নিঃশব্দে নেমে এল। কিছু যে একটা ঘটছে তা টের পাবার আগেই শিকারীর গলায় ফাঁস আটকে গেল, আর সে দুলতে দুলতে মাটি ছেড়ে হাওয়ার রাজ্যে উঠে যেতে লাগল নিঃশব্দে। গলায় ফাঁস আটকে রয়েছে, দমও আটকে গিয়েছে—শব্দ করবারও আর শক্তি নেই।

দড়িটা গাছের ডালে বাঁধল টারজান। শিকারীটা ঝুলতেই থাকল।

টারজান নেমে এল গাছ থেকে। গর্তে ওটা কি জানোয়ার?

অবাক্! ভাল করে দেখে টারজানও অবাক্ হয়ে গেল! জীবনে সে হাজার হাজার সিংহ দেখেছে কিন্তু এরকম সিংহ সে দেখেনি কোনদিন।

এই সোনার বরণ 'অতি-সিংহ' শিকারীর ফাঁদে পড়ে মরবে?—তা' আর টারজান থাকতে নয়! টারজান মৃদুকণ্ঠে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা কইতে লাগল। সে ভাষা মানুষের নয়,—সিংহের।

গর্তের গভীরে দানোর 'জ্বলন্ত' চোখ জলে ভ'রে এল। কে এ দরদী বন্ধু? বিপদের ক্ষণে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে?



শিকারীর গলায় ফাঁসটা আটকে গেল। [পৃষ্ঠা—১২১

একটা গাছের গুঁড়ি প'ড়ে ছিল কাছেই। টারজান সেই গুঁড়িটা হেলিয়ে নামিয়ে দিল কূপের ভেতর! দানো সেই হেলানো গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল অতি কষ্টে। তারপর টারজান দেখতে লাগল দানোকে। দানো দেখতে লাগল টারজানকে। দেখতে দেখতে দু'-জনেই যেন দু'জনের অন্তরের পরিচয় পেল। এক সময় টারজান তার হাতখানি রাখলো দানোর ঘাড়ের কেশরের উপরে। এরপর দু'জনে পাশাপাশি চলতে চলতে মিলিয়ে গেল গভীর অরণ্যে।

এগার

জিওনকাঠি মরণকাঠি

সোনার শহরের রাজা বয়সে তরুণ। ভারী সুন্দর চেহারা, মণিমুক্তায় সেজে সিংহরথে চড়ে যখন রাজপথে ভ্রমণ করেন, প্রজারা ভাবে ইনি দেবতা, ইনিই ভগবান।

অথচ লোকটির যে দয়ামায়া বলে কোন বস্তু নেই, তারও পরিচয় তারা যখন-তখনই পাচ্ছে। মানুষের জীবন এই রাজার কাছে খেলার জিনিস ; এমন দিন যায় না, যেদিন তাঁর পালিত সিংহের মুখে দু-চারটা বন্দীকে তিনি ছুড়ে না ফেলেন।

মজা এই, এতখানি নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও প্রজাদের অটুট ভক্তি তাঁর উপরে। অবশ্য অসন্তুষ্ট লোকও রাজ্যে আছে ; কিন্তু তারা মনের ঝাল মনেই রাখে, রাজার কথায় প্রতিবাদ করবার মত সাহস তাদের কখনো হয় না।

দানো ধরা পড়েছে শুনে রাজা নিজে এলেন পল্টন সঙ্গে করে। দুশমনকে ধরে নিয়ে যেতে হবে ; রীতিমত জাঁকজমক করেই রাজা এলেন, কাড়া-নাকড়া ঢাক-ঢোল বাজিয়ে। সোনার সাঁকো পেরিয়ে এল তাঁর রথ ; বারোটা বড় বড় সিংহ সেই রথে জোড়া।

পল্টন গিয়ে দাঁড়াল কূপটা ঘিরে। কিন্তু এ-কী ? কূপের ভিতর দানো কই ? আর কূপের ভিতর ওই গাছের গুঁড়িটা কেন ? সেই শিকারীটাই বা গেল কোথায়, যে ফাঁদ পাহারা দেবার জন্য এই বনের ভিতরেই ছিল ?

রাজা রেগে আগুন! তলব করলেন সেই শিকারীকে, যে তাঁকে খবর দিয়ে এনেছে। "ফেলে দাও সিংহের মুখে! এই মিথ্যুকটা অকারণে কষ্ট দিয়েছে আমায়!"

ঠিক সেই সময় কে একজন উপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল—"রাজা! রাজা! ওই দেখুন!"

রাজা দেখলেন, অন্য সবাইও দেখল। একটা শিকারী গলায় দড়ি-বাঁধা অবস্থায় গাছের ডালে ঝুলছে।

এ কী কাণ্ড? কে ওর এ দশা করল?

রাজা উলটো বোঝেন—তাঁর ধারণা হল যে, এ তাঁর শত্রুদের কাজ। কে সে শত্রু, দানোকে খালাস করে দিয়ে, একটা তুচ্ছ শিকারীকে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে, রাজার শত্রুতা কী করে সে করতে পারে—অত চিন্তা তাঁর করবার দরকার নেই। যারা এর ভিতর জড়িত আছে, সিংহের মুখে ফেলে দাও তাদের। অন্য শত্রুদের পরে খুঁজে দেখা হবে, এমন সমুখে পাওয়া যাচ্ছে যে লোকটাকে, তাকে আগে দাও সাবাড় করে।

রাজার রথ থেকে বড় একটা সিংহকে খুলে আনা হল। শিকারীটা ভয়ে বেহুঁশের মত দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। তাকে যে কেন আচমকা এভাবে মরতে হবে, তা তার মাথায় কোনমতেই যেন ঢুকতে চাইছে না।

সিংহটাকে এনে ওর সমুখে দাঁড় করানো হল। সিংহ শুঁকে দেখল ওকে। তারপর লোকটাকে বলা হল ছুটে পালাতে।

পালানো? আশার আলো ঝলকে উঠলো ওর চোখে। কিন্তু সে এক পলকের জন্য। পালানো যে যায়ই না এরকম ক্ষেত্রে, তা

ওর মনে পড়ে গেল। মানুষটা একশো গজ এগিয়ে যাবার পরই অবশ্য সিংহটাকে খুলে দেওয়া হবে; কিন্তু একশো গজ আগের লোককে ধরে ফেলতে সিংহদের বেশী সময় লাগে না। গাছে উঠে জীবন রক্ষার চেষ্টার নিয়ম নেই; সে-চেষ্টা কেউ করলে, তাকে তখনই ধরে নামিয়ে আনা হবে, আর দৌড়ঝাঁপের সুযোগ না দিয়ে তক্ষুনি সোজাসুজি ফেলে দেওয়া হবে সিংহের মুখে।

কাজেই, পালানোর আশা কিছুমাত্র নেই।

তবু, একটা চেষ্টা! চেষ্টা বিফল হবে জেনেশুনেও একটা চেষ্টা সবাই করে। এ-লোকটাও করবে।

সংকেত হল—ঢাকের উপর এক ঘা! সেই সংকেত পেয়ে লোকটা ছুটল বন ভেঙে, ঝোপঝাড় আগাছা ভেদ করে। আশা এই যে ঘন জঙ্গলের আড়ালে যেতে পারলে সে হয়ত যা-হোক একটা উপায় করতে পারবে জীবন বাঁচাবার জন্য।

একশো গজ যেতে না যেতেই পিছনে একটা হুংকার উঠল। সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শিকার ধরবার জন্য; এ তারই হুংকার। এক এক লাফে এক একটা ঝোপ অতিক্রম করে পশুরাজ ছুটল তার খাদ্যের পিছনে।

ঝোপঝাড়ের আড়াল? মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব, সিংহের চোখকে নয়। অভ্রান্তভাবে ছুটে আসছে রক্তপাগল জানোয়ারটা—

যা-হোক একটা উপায়?—গাছগুলো মোটা মোটা; ডাল-পালা অনেক উপরে; উঠতে সময় লাগবে অনেক। ততক্ষণে সিংহ এসে এক লাফে তাকে টেনে নামাবে।

লোকটার মরণশ্বাস উঠেছে। ছুটতে ছুটতে টলে পড়তে যাচ্ছে বার বার। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়, মুখে উঠছে ফেনা। বারে বারে কাঁধে হাত দিচ্ছে; যেন হাত বুলিয়ে দেখছে—সিংহটা এসে কাঁধে পড়েছে কি না!

ওই! ওই! সিংহ আর দশ হাত দূরেও নেই!

একটা বড় গাছের তলা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল লোকটা। সিংহটাও যাবে, কিন্তু তার আর যাওয়া হল না। গাছ থেকে নেমে এল মোটা একগাছা লতার দড়ি; তার মুখের ফাঁস এমনভাবে জড়িয়ে গেল সিংহের গলায় যে দৌড়ের মুখে আচমকা পিছটান লেগে উল্টে সে পড়ে গেল গাছতলায়।

ফাঁসটা এমন আঁটো হয়ে গলায় বসল যে, জোর গলায় একটা হাঁক ছাড়বার শক্তিও রইল না সিংহের। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সে সুমুখপানে ছুট দেবার উদ্যোগ করছে আবার—

এমন সময়ে গাছের ডাল থেকে ঝুলে নেমে পড়ল টারজান, আর পড়ল ঠিক ক্রুদ্ধ পশুরাজের পিঠের উপরে।

পরের মুহূর্তেই তার ভোজালি আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল সিংহের উদরে। আর্তনাদের পর আর্তনাদ! সিংহের মরণ-যাতনার চিৎকারে অবাক্‌ হয়ে পিছন ফিরে তাকাল পলায়মান শিকারী; আর এদিকে অবাক্‌ হয়ে সমুখ পানে ছুটল সোনা-শহরের পল্টন।

মরা সিংহটার গলা থেকে দড়ির ফাঁস খুলে নিল টারজান। দড়ি বেয়ে গাছে উঠে যাবে, এমন সময় একটা ভয়ংকর দৃশ্য চোখে পড়ল তার। সিংহবধ করে যে শিকারীটাকে সে উদ্ধার করেছে, তার জীবন আবার বিপন্ন। পিছনে তার স্বয়ং দানো!

দানো এসেছে টারজানকে খুঁজতে। জীবনদাতার উপর এত অনুরক্ত হয়েছে দানো যে, তার তিলেক অদর্শনও সে সইতে পারছে



টারজান পড়ল ঠিক পশুরাজের পিঠের উপর [পৃষ্ঠা—১২৭

না। টারজানের সমুখে শিকারীটাকে দেখেই সে ধরে নিয়েছে যে, শত্রুতা সাধন ছাড়া ওর আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। তাই বন্ধুর শত্রুকে শেষ করে দেবার জন্য সে লাফ দিতে উদ্যত হয়েছে, ছোট্ট একটা ঝোপের ওদিক থেকে।

টারজান সিংহভাষায় তাকে বলে উঠল—"বন্ধু! বন্ধু! এ বেচারাকে মেরো না। ওকে আমি এই মাত্রই বাঁচিয়েছি। তোমার ক্ষিদে পেয়ে থাকে যদি, চলো, এক্ষুনি একটা হরিণ মেরে দু'জনে ভাগাভাগি করে খাব।"

অবাক্!

সোনা-শহরের পল্টন এসে পড়েছে। এসে পড়েছেন সিংহ-রথে চড়ে স্বয়ং রাজা। বেশ কিছুটা দূর থাকতেই অবাক্ হয়ে রাজা দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়ে পড়ল সোনা-শহরের পল্টন।

একটা আশ্চর্য চেহারার মানুষ! আর সেই দানো!

গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা আর পশুটা! এত বড় সিংহও আর কেউ দেখেনি; এত লম্বা-চওড়া মানুষও না। অবাক্ হয়ে সেই হাজার মানুষ তাকিয়ে রইল সেই জুড়িটার দিকে।

লোকগুলোর দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে টারজান মৃদুস্বরে দানোকে বলতে লাগল—"বন্ধু! ওদের বিশ্বাস নেই। তুমি এইবেলা তীরবেগে ছুটে ঘন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যাও। আমি এই দড়ি বেয়ে গাছে উঠে পড়ব বেকায়দা দেখলে। তবে ওরা যদি ভাল ব্যবহার করে, আমি ওদের সঙ্গে একবার ওদের শহরে যেতেও পারি। অর্থাৎ আমি